গ্রাম্য বালিকা

১

দেখ্‌লেই বোঝা যায়, গৃহস্বামীর অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ছিল। রান্নাঘর, ঢেঁকিশালা, গোয়ালঘর, শোবার ঘরে টিনের চাল, তা' ছাড়া প্রকাণ্ড বড় ভিটে মাটির প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

কিন্তু এখন উঠানে ভ্যারাণ্ডা গাছ জন্মেছে। প্রাচীর গিয়েছে ভেঙে, আর গোয়ালঘরের চাল পচে ক্ষয়ে, স্থানে স্থানে বৃষ্টির জলে ধুয়ে, বাখারি বার হয়ে গেছে। পুঁই চারার মত এক প্রকার চারাগাছ জন্মেছে তার উপর। টিনের চাল, মনিবের অযত্ন অবহেলা তার অত সহজে বোধ হয় গায় লাগে না, তাই এখনও ঠিক আছে। কিন্তু ঘরের দাওয়াটা দখল করেছে গাঁয়ের ভোমরা ষাঁড়।

সমস্ত দিন চরে বেড়িয়ে রাত্রে এসে এখানে শুয়ে থাকে। যেন সে-ই বর্ত্তমানে বাড়ীর মালিক। অথচ নবীনের বাবা হরিচরণের কি গুমরটাই না ছিল। নবীন কারখানার মিস্ত্রী, ষাট টাকা মাইনে পেত। নির্দ্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত পরিশ্রম কর্‌লে উপরি পাওনাও ছিল। কাজেই লাঙ্গল-চষা, জন-খাটা, মাসে পাঁচ সাত টাকা উপায়-করা ছেলেদের চাইতে সে ভাল বৈ কি। হরিচরণ বুক ফুলিয়ে বেড়াতো। পাড়ায় এই প্রসঙ্গ উঠ্‌লেই সে 'আমার নবীন' বলে' আরম্ভ কর্‌তো। আর কোন মেয়ের বাবা তার মেজাজ পরখ্‌ কর্‌তে এলে হরিচরণ প্রথমেই বল্‌তো, আমি অনাবৃষ্টিকেও ভয় করিনে, বন্যে বুড়োও গ্রাহ্য করিনে, দেশ হেজে যাক্‌, মজে যাক্‌, মাসে পনর গণ্ডা টাকা আমার কেউ নেবে না। তার অবস্থা যখন গ্রামের লোকদের মত নয়, তখন তাদের মত থাকাও ভাল দেখায় না। সে ঘরের চালে খড় ফেলে দিয়ে টিন বসালো। প্রাচীর দিয়ে ঘির্‌লো বাড়ীটা। আরও একটা

মতলব তার ছিল। ইচ্ছে ছিল একটা চণ্ডীমণ্ডপ তুলে অন্ততঃ ছ'খানা টিনের চেয়ারও সেখানে রাখ্‌বে। কিন্তু সে ইচ্ছে তার পূর্ণ হ'ল না, কারণ, যে ভবিষ্যতের উপর সে নির্ভর কর্‌লো, সেই ভবিষ্যৎকে তার উপর প্রসন্ন না হয়ে বরং অপ্রসন্নই হ'তে দেখা গেল।

নবীন বল্‌লো, ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে আটটায় হাজ্‌রে দিতে আর পারিনে বাবা, আমি এখন কলকাতাতেই থাক্‌বো।

হরিচরণ চুপ করে রইল, কোন জবাব দিল না। বুকের ভিতরটা তার ঢিপ ঢিপ কর্‌তে লাগ্‌লো। কিছুদিন থেকে নবীনের উপর তার সন্দেহ হচ্ছে। এখন সে আর সকল দিন ঠিক সময় বাড়ী আসে না। মাস কাবারে মাইনেও পুরো এনে দেয় না। গত মাসে দিয়েছে অর্দ্ধেক। এর উপর যদি আবার কলকাতায় থাকে—হরিচরণ আর ভাব্‌তেই পার্‌লো না।

—কৈ, কিছু বল্‌ছ না যে ?

হরিচরণ আরও খানিক গুম্ হয়ে থেকে বল্‌লো, আশ-পাশের গ্রামের ছেলেরা ত বাড়ী থেকেই যাতায়াত কর্‌ছে। রাজপুরের মুখুজ্যেদের ছেলে—

—তাদের কথা ছেড়ে দাও বাবা, সাড়ে দশটায় অফিস, ধীরে সুস্থে খেয়ে দেয়ে যায়। ভোরে উঠে তাড়াতাড়ি ছুটো নাকে মুখে গুঁজে গিয়ে সারাদিন ধরে তাদের হাতুড়ি পিট্‌তে হয় না।

তা' সত্যি, অনেক পরিশ্রমের চাকরী। হরিচরণ আর কিছু বল্‌তে পার্‌লো না। কিন্তু ভবিষ্যতের এক অনিশ্চিত আশঙ্কায় তার অন্তরটা কেঁপে উঠ্‌লো।

নবীন বল্‌লো, তুমি অত ভাব্‌ছ কেন বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে। আমার জন্যে কি আট্‌কাবে ? কিছুই ত করিনে। যতক্ষণ বাড়ী থাকি, হয় ঘুমুই, আর না হয় পাড়ায় ঘুরে বেড়াই। তা' ছাড়া আমি ত প্রত্যেক হপ্তাতে বাড়ী আস্‌বো।

—তাই এসো। কথাগুলো মুখ দিয়ে স্পষ্ট বার হলো না।

পরদিনই নবীন বিছানাপত্র বেঁধে নিয়ে চলে গেল। যে ছোট্ট রঙীন সতরঞ্চখানা ও চীনা মাছুরটা হরিচরণ শ্রীপুর রাস দেখ্‌তে গিয়ে কিনে এনেছিল, বাড়ীতে লোক এলে কখনও এটা কখনও ওটা পেতে বস্‌তে দিত, সে ছুটোও নিয়ে গেল।

শনিবারের দিকে তাকিয়েই হরিচরণ সমস্ত সপ্তাহটা কাটালো। নিশ্চয় ক'রে কিছুই জানে না, কেবলমাত্র একটা সন্দেহ। তার কেবলই মনে হচ্ছে, যে হাওয়ায় সংসার-তরণী এতদিন চলছিল সে এখন অন্য দিকে ফিরেছে; কিন্তু এ অনুমান মিথ্যেও ত হ'তে পারে? সময় বিশেষে কি তার ছু' টাকা বেশী দরকার হতে পারে না? সে একটা জীবন্ত মানুষ, যন্ত্র নয় যে, তিন শ' পঁয়ষট্টি দিন ঠিক একই সময় বাড়ী আস্‌বে। কাজের জন্যেও ত দেরী হ'তে পারে। কিন্তু এ চিন্তা তার মনে বেশী ক্ষণ স্থান পায় না। পরক্ষণেই বিপরীত ভাবনা এসে জোটে। এমনি দোটানার মধ্য দিয়ে হপ্তার দিনগুলো একে একে কেটে শনিবার এসে পড়্‌লো।

৪

<u>গ্রাম্য বালিকা</u>

যথাসময়ে নবীনও ছটো আনারস হাতে করে বাড়ী এলো।

দাওয়ায় সে ছটো রেখে গায়ের আধ-ময়লা সার্টটা খুলতে খুলতে নবীন বললো,এ উতোরপাড়ার আনারস বাবা, শুনেছি খুব মিষ্টি। খেয়ে দেখা যাক্, যদি ভাল হয় আমরাও লাগাবো।

হরিচরণ হেসে বললো, লাগালেই কি ভাল হবে, ও মাটির গুণে হয়।

—না হলেও আমি লাগিয়ে দেখ্‌বো।

বলতে বলতে নবীন খালি গায়ে উঠানে এসে দাঁড়ালো।

এই কদিনে নবীন ঈষৎ রোগা অথচ ফর্সা হয়েছে। মনও বেশ প্রফুল্ল।

—ওখানে আমের চারা লাগিয়ে ভাল করোনি বাবা, এর পর বাড়ী অন্ধকার করে' দেবে। ও আমি তুলে ফেলবো। ঘরের পাশে যে গাছটি হয়েছে, তা'তেই হবে। বেশ করে' কাঁটা তার

দিয়ে ঘিরে ওখানে তরকারীর চাষ কর্‌বো। কপি লাগাবো। চারা কিনে আন্‌বো গ্লোব নার্সারি থেকে!

তারপর নবীন সেই আমের চারা, ছুটির দিকে চলে গেল। হরিচরণ তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। যেন খাঁচার পাখী ছাড়া পেয়েছে। মুক্তির আনন্দ তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে উছ্‌লে পড়ছে। রাতটুকু কলকাতায় থাক্‌তে পেয়ে সে এত খুসী হয়েছে! হবেই বা না কেন। পরিশ্রমের লাঘব হয়েছে ত কম নয়। সংসারে টানও বেড়েছে বই ত কমে নি। সে যা সন্দেহ করে তা সত্যি হলে, এটা কখনও সম্ভব হ'ত না। মিথ্যে, মিথ্যে, সম্পূর্ণ মিথ্যে, তার ছোট মন, তাই এ সব চিন্তা তার মনে জাগে। ত্বরিত পদে ছেলের কাছে গিয়ে বল্‌লো,

—তা এখানে কপি লাগালেই হয়। গ্রামের লোকও দেখে একটা নতুন জিনিষের চাষ।

—লাগালেই হয় কি, লাগাবোই। আমি চারা কিনে নিয়ে আস্‌বো। আর বেড়ার ধারে

ধারে গোটা কয়েক নারকেলের চারা বসাবো। নারকেল গাছ দিলে ভিটে মানায় ভাল।

নবীন চলে গেল কলকাতায়। এঁকে দিয়ে গেল হরিচরণের মনে একটি মোহিনী কল্পনার ছবি। মাটির প্রাচীর দিয়ে ঘেরা বাড়ী। পাশে কপির ক্ষেত। বেড়ার ধারে ধারে নারিকেল গাছ। মানস চক্ষে হরিচরণ সেই ছবি দেখে, আর জমিতে গিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। লতা, পাতা, কি কোন আগাছা চোখে পড়্লেই তুলে ফেলে দেয়। কোন লোকের সঙ্গে দেখা হলে বলে, খুব ভাল করে চাষ দিতে হবে। এবার এখানে কপি লাগাবো। তারপর একদিন সে আর থাক্‌তে না পেরে রামেশ্বরকে ডেকে এনে বল্‌লো,

—দে বাবা, দে, এই জায়গাটায় দু'পাক লাঙ্গল ঘুরিয়ে দে।

কবে কি হবে তার ঠিক নেই, জমিতে চাষ দেওয়া হয়ে গেল।

আজ শনিবার। নবীনের বাড়ী আস্‌বার কথা। কিন্তু সন্ধ্যার পর আস্‌বার প্রথম গাড়ীটা চলে গেল, সে এল না।

নবীনের মা বল্‌লো,

—এসো,খেয়ে নাও,আর বসে থেকে কি কর্‌বে ?

—পরের গাড়ীটা দেখি, একটু সবুর কর।

কিন্তু সে গাড়ীও চলে গেল, কোন কোন দিন তার পরের গাড়ীতে আসে, সেটাও চলে গেল, নবীন এল না।

রাত্রি এগারটার সময় হরিচরণ একলা খেতে বস্‌লো। কোন কথা বল্‌লো না। নিঃশব্দে আহার শেষ করে' শুয়ে পড়্‌লো। ভাব্‌তে লাগ্‌লো, কেন এলো না। অসুখ-বিসুখ করে নি ত ? তা' হলে ত আগেই আস্‌ত। যদি বেশী অসুখ হয় ? কিন্তু চিন্তার গতি ওখানেই থেমে গেল। সুরু হ'ল বিশ্বাস অবিশ্বাসের টানা-পোড়েন। সত্যিই কি নবীনের চরিত্র খারাপ হ'ল ? কি করে সে মুখ দেখাবে লোকের কাছে। যাদের প্রতি তার

অবজ্ঞার অবধি ছিল না, যাদের সে মানুষ বলেই মনে কর্‌তো না, তারা এখন মুচ্‌কে হাস্‌বে। সে যন্ত্রণা যে মৃত্যু-যন্ত্রণা অপেক্ষাও তীব্র। হরিচরণ এপাশ ওপাশ কর্‌তে লাগ্‌লো। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুম এলো না। কিন্তু সকালে উঠে রাত্রের কথা মনে করে সে হেসে ফেল্‌ল। সে কি পাগল হয়েছে। আসেনি, আস্‌তে পারে নি বলে আসে নি। আস্‌বার হয়ত দরকার মনে করে নি। তাই বলে সে খারাপ হয়ে গেল? কিন্তু পরক্ষণে চাষ দেওয়া জমিটার দিকে নজর পড়্‌তে বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠ্‌লো।

পরের সপ্তাহে নবীন এসে ভিটেয় পা দিতে না দিতেই হরিচরণ জিজ্ঞাসা কর্‌লো,

– গত শনিবারে এলি নে যে?

—নতুন ঘর ঠিক কর্‌তে দেরী হ'ল বলে' আস্‌তে পার্‌লাম না। যেখানে গিয়ে উঠেছিলাম সেখানে বাড়ীওয়ালার সঙ্গে বন্‌লো না।

—যাক্, এখন ঠিক হয়েছে ত ? আর কোন অসুবিধে নেই ?

—না, আমরা পাঁচজন মিস্ত্রী একসঙ্গে থাক্‌বো।

হরিচরণ নিশ্চিন্ত হ'ল।

কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই তার হাসি ও কান্নার বিবাদের শেষ মীমাংসা হয়ে গেল। একজন তাকে ছেড়ে গেল এ জীবনের মত। রাত্রে ছেলের সঙ্গে খেতে বসে একটা গন্ধ নাকে যেতেই সে চম্‌কে উঠ্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের এক অকল্যাণ মূর্ত্তি নগ্নরূপ নিয়ে তার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌লো। কি যে বল্‌বে ভেবে পেল না। অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বল্‌লো,

—তুই মদ খেয়েছিস্, নবীন ?

—তারা জোর করে খাইয়ে দিল।

হরিচরণ তখন আর কিছু বল্‌লো না। পরদিন বল্‌লো,

—তুই কলকাতায় থাকৃতে পাবিনে, রোজ বাড়ী

আস্‌বি। নবীন কোন জবাব দিল না। সে যথা সময়ে কলকাতায় চলে গেল।

নবীন আর বাড়ী এল না। এক হপ্তা এক হপ্তা করে দীর্ঘ ছ'মাস কেটে গেল। হরিচরণ আশায় আশায় থেকে শেষ পর্য্যন্ত আশা ছেড়ে দিল। ভবিষ্যৎ উন্নতির কল্পনা ছুটে গেল। লোকের মুচ্‌কে হাসার ভয়ও ছুটে গেল। এসে দেখা দিল উপোস করে মর্‌বার ভয়। ছ'মাসের মধ্যে একটা টাকাও সে পাঠায়নি। কাছে যা ছিল খরচ হয়ে গেছে। সংসার আর চলে না। এখন মাসে পাঁচ সাত টাকা উপায়-করা লোকদের সঙ্গে সমানে মাঠে খাট্‌তে হবে, আর না হয় উপোস করে মর্‌তে হবে। গ্রামের লোক বল্‌লো, কলকাতায় গিয়ে দেখা কর, বল টাকা দে।

—দরকার নেই টাকায়।

তবু দু'একজন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নবীনের সঙ্গে দেখা কর্‌লো।

নবীন মৃদু হেসে বল্‌লো, যাবো, শীগ্‌গীরই বাড়ী

যাবো। কি সরল, অমায়িক। কেউ অবিশ্বাস করতে পারলো না। কিন্তু একদিন একদিন করে তারপরেও একমাস কেটে গেল, নবীনের দেখা নেই। হরিচরণ বললো, সে এমন একটি চক্রের মধ্যে পড়েছে, যার বাইরে আসা তার পক্ষে শক্ত। আমার মনে হয়, সেই চক্রের পরামর্শে সে কলকাতায় গিয়ে আড্ডা নিল।

যাই হোক, তারা আর একবার চেষ্টা করলো। তিন চার জনে দল বেঁধে গেল দেখা করতে। কিন্তু সে দেখা দিল না। কারখানায় প্রবেশ নিষেধ। দারোয়ানকে দিয়ে খবর পাঠালে সে ফিরে এসে বললো, মোলাকাৎ নেহি হোগা। এতটা কেউ আশা করেনি। অধঃপাতের একেবারে শেষ ধাপে নেমে গেছে।

হরিচরণ সব শুনলো, কিছু বললো না। দিন দুই পরে সে ভাল গাই গরুটা বিক্রী ক'রে দিল।

প্রতিবেশী রামেশ্বর বললো, এতখানি ক'রে দুধ দিচ্ছিল, কেন বিক্রী করলে ?

—কি হবে ? আমি অত দুধের ভক্ত নই ছেলে বয়স থেকেই। তুই এই জমিটুকু নিস্ ত বল্, তোর নামে লেখাপড়া করে দেই। যা কর্‌বি তাই হবে, তোর ভিটেটাও ঠিক মানাবে।

—কেন, তুমি কপি লাগাবে বল্‌ছিলে যে !

—না।

—তুমি পাগল হ'লে কাকা ?

—হ'লে তো বাঁচ্‌তাম, এত মনের কষ্ট ভোগ কর্‌তে হ'ত না।

হরিচরণ আগে চুপটি করে বাড়ী বসে থাক্‌তো। সুমুখের পথ দিয়ে কাউকে যেতে দেখ্‌লেই ডাক্‌তো, এসো, তামাক খেয়ে যাও। এখন কাউকে ডাকে না, তাই নয় ; বাড়ীতেও থাকে না, পাছে কেউ আপনা থেকেই এসে প'ড়ে। লোকের সাহচর্য্য তার ভাল লাগে না। তাই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। এমনি একদিন ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে রামেশ্বরদের বাড়ী উপস্থিত হ'ল। রামেশ্বর উঠানে বসে বিচালি কাট্‌ছিল।

—এসো কাকা, বসো।

রামেশ্বর ঘরের দাওয়া থেকে একটা থলে টেনে নিয়ে এসে ভাঁজ করে উঠানেই বস্‌তে দিল।

হরিচরণ বস্‌লো। কোন কথা বল্‌লো না। একদৃষ্টে তার বিচালি কাটা দেখ্‌তে লাগ্‌লো। মাঠ থেকে এসে নেয়ে খেয়েই ঘাস কাট্‌তে বসেছে। এখনও তার গায়ের তেল শুকায়নি, মুখে মাথায় জব জব কর্‌ছে। গালের পান তখনও গালে রয়েছে। মাঝে মাঝে আহারের উদ্গার তুল্‌ছিল। তার কর্ম্মরত হস্ত দুটি সঞ্চালিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাহুদ্বয়ের স্থূল মাংসপেশী দুটিও নড়ছিল। নধর নিটোল হৃষ্টপুষ্ট যুবক, নবীনের মত ক্ষয়াটে নয়। হরিচরণ চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো। পুত্রগর্ব্বে কি অবজ্ঞাই না তাদের করেছে। যেন মানুষের মধ্যে গণ্য ছিল না। সেই পাপের আজ প্রায়শ্চিত্তের দিন।।

—তোরা ক'জনে গাঁতা করেছিস্ রামেশ্বর?

—তিনজনে।

—তা'হলে তিনদিন দিলেই পাওয়া যাবে তো ? কাল যাবো তোদের সঙ্গে।

—তুমি যাবে লাঙ্গল চষ্‌তে ?

—কেন, পার্‌বো না ?

—এতকালের অনভ্যেস, মরে যাবে কাকা, এই কাঠ-ফাটা রোদে সকাল থেকে বেলা তিনটে পর্য্যন্ত—

—উপোস করে মরার চাইতে খাট্‌তে খাটতে মরা ভাল।

—একটা লোক রাখ না ?

—মাইনে দিতে হবে ত ?

—তা' দিতে হবে বৈ কি কিছু।

—পার্‌বো না।

রামেশ্বর যা বল্‌লো, হ'লও তাই। তিন দিন লাঙ্গল চষার পর চার দিনের দিন নিজের ক্ষেতে চাষ দিতে দিতে হরিচরণের জ্বর এলো। বাড়ী এসে শুলো আর উঠ্‌লো না। দুদিন ঘোর অচৈতন্য থাকার পর তিন দিনের দিন মারা গেল।

নবীনকে খবর দেওয়া হয়েছিল। সে এসে ডাক্তার বগ্যি দিয়ে অনেক চেষ্টা করলো। কিন্তু কোন ফল হ'ল না।

নবীনের মা অনেক কাঁদলো কাটলো। অবশেষে ছেলের মুখ আর দেখবে না প্রতিজ্ঞা করে ভাইয়ের বাড়ী চলে গেল। নবীন দিন কয়েক মন-মরা হয়ে থেকে আবার রঙের নেশায় মেতে উঠলো। কিছুদিন পরে খবর এলো নবীনের মাও মারা গেছে। কি অসুখে মরলো, মরবার সময় নবীন কাছে ছিল কি না, সে সব খবর অবশ্য পাওয়া গেল না।

গ্রামের যারা হরিচরণের উন্নতি ও অহঙ্কারে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরতো, পরে নবীনের কুপথ গমন ও হরিচরণের মনস্তাপে আনন্দ উপভোগ করতো তারা এখন বলতে লাগলো, 'লোক ঘরটা ছিল তবু, সময় অসময় টাকাটা সিকেটা সাহায্য পাওয়া যেত; সেবার তারাপদ অসুখে পড়লে খরচা করে তার আবাদ ত হরিচরণই তুলে দিয়ে ছিল; আর সে সাহায্য পাওয়া যাবে না, সব

শেষ হয়ে গেল।' আর এত তাড়াতাড়ি মারা গেল যে, আমরাও এই সুরুতেই শেষ করে দিতাম, ভাঙা ঘর তালি দিয়ে খাড়া করে রেখে বিনিয়ে বিনিয়ে গল্প বলে সময় নষ্ট করতাম না, যদি না গাঁয়ের পাঁচকড়ি একদিন দুপুরবেলা অপ্রকৃতিস্থ অর্দ্ধ-চেতন নবীনকে মাঠের এক গাছতলা থেকে ধরে নিয়ে এসে তার সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়ে আমাদের তাক লাগিয়ে দিত। হরিচরণের এই দশা হওয়ার পর তার হাতে পড়ে বালিকা বধূটির কি অবস্থা হয় তা' দেখার লোভ সম্বরণ করা যায় না।

২

পাঁচ বছরের ছোট ভাইকে আগে নিয়ে কালিদাসী দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ও-পাড়ায় তার মাসীর বাড়ী যাচ্ছিল বেড়াতে। তার মেসো বাড়ীর ভিটের পাশে এক বিঘে বেগুন দিয়েছে। প্রথম প্রথম বেশ বিক্রী হয়েছিল। এখন পয়সায় দু'সের। এক ঝাঁকা নিয়ে গেলে তার জনের দামটাও হয় না। তাই পাড়ায় বিলোয়। তাদের বলেছে গিয়ে তুলে আন্‌তে। সে আগে ক' দিন নিয়ে এসেছে। আজও আস্‌বার সময় নিয়ে আস্‌বে।

—তা' বলে আজ তুমি বেগুন ক্ষেতে ঢুক্‌তে পাবে না, হাবু।

—কেন, আমি ত বড় বড় বেগুন তুল্‌তে পারি।

—সেদিনের মত কাঁটা ফুটে যাবে।

—না, আমি তুল্‌বো।

—তা' হ'লে তোমাকে আর কোন দিন নিয়ে আস্‌বো না।

—আমি বসে থাক্‌বো আর তুমি তুল্‌বে?

—হ্যাঁ, তুমি চুপ করে দাওয়ার ওপর বসে থাক্‌বে, আর আমি তুল্‌বো।

—আচ্ছা।

আধাপথে বাঁ হাতের একটা বাড়ীর উঠোন থেকে আধা-বয়সী একটি একহারা স্ত্রীলোক দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বল্‌লো,

—বেশ ত বাবু'নি করে বেড়াতে যাওয়া হচ্ছে, এসো দিখিনি, দেখ দিখিনি তোমার ভাতার কি করেছে?

কালিদাসী তার মুখের দিকে চেয়ে রইল, বুঝ্‌তে পার্‌লো না, ব্যাপারটা কি।

—ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছ যে? এসে দেখ, পরিষ্কার করে দিয়ে যাও।

পাশের বাড়ীর উঠানেও একটি স্ত্রীলোক কাজ কর্‌ছিল, হাতের কাজ ফেলে রেখে সে মধ্যবর্ত্তী বেড়ার ধারে এসে বল্‌লো,

—কি হয়েছে দিদি?

—আর বলিস্ কেন ? বছরকারের দিন, নতুন ধান আস্‌বে বাড়ী, বেশ করে উঠোন গোবর দিলাম। কোথা থেকে মাতালটা টল্‌তে টল্‌তে এসে মাঝখানে হড়্ হড়্ করে এক কলসী বমি করে দিয়ে গেল। যা, পরিষ্কার করে দিয়ে যা।

এতক্ষণে কালিদাসীর কাছে ব্যাপারটা সরল হ'ল, কিন্তু পরিষ্কার কর্‌তে সে এলো না। যেখানে যাচ্ছিল চলে গেল।

—দেখ্‌লি ছুঁড়িটার ব্যাভার, নইলে আর এ রকম হয়। কত খোয়ার হবে দেখিস্।

দাওয়ায় মাতুর পেতে বসে' মাসী কাঁথা শেলাই কর্‌ছিল, এরা তুজনে গিয়ে দাঁড়ালো। একবার চোখ তুলে চেয়ে মাসী শেলাই কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লো, দাঁড়ালি কেন, আয় উঠে আয়।

তারা উঠে মাতুরে গিয়ে বস্‌লো।

গোটা কয়েক ফোঁড় দিয়ে মাসী বল্‌লো, কই কোন কথা বল্‌ছিস্‌নে যে কালি ?

—কি কথা বল্‌বো ?

—মুখখানা ভার ভার দেখাচ্ছে, মা বকেছে ?

—না।

—কি হয়েছে রে হাবু ?

—হাবু হাত দিয়ে দেখিয়ে বল্‌লো, মা এত বড় বেগুন পুড়িয়েছিল, দিদি একলা আধখানা খেয়ে ফেলেছে।

—তাই তোর মা বকেছে না কি ?

—বকেছে, দূর।

বলেই কালি উঠে দাঁড়ালো।

—উঠ্‌লি যে ?

—যাই।

—কেন, যাবি কেন, এলি, একটু বোস্‌।

—না।

—তবে বেগুন নিয়ে যা তুলে।

—থাক্‌ গে আজ।

—আবার থাক্‌বে কেন, যা নিয়ে যা।

—তবে তুই তুলে দে।

মাসী বেগুন তুলে দিল। সে কাপড়ের আঁচলে বেঁধে নিয়ে এসে তার মা যেখানে যাঁতায় ডাল ভাঙছিল সেখানে ঢেলে দিয়ে বল্‌লো, গোবরাদার মা কি বল্‌ছে শুন্‌গে যা।

—কি বল্‌ছে ?

—গাল দিচ্ছে।

—কেন ?

—তা' আমি জানিনে, তুই দেখ্‌গে যা।

—তবু !

—বল্‌ছি আমি জানিনে।

সে খেঁকিয়ে উঠ্‌লো।

কালীর মা যখন এলো তখন তাদের পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। সব শুনে বল্‌লো, রাগ করিস্‌নে দিদি, সে কি আর একটা মানুষ।

ফিরে গিয়ে দেখ্‌লো কালী ডাল ভাঙ্‌ছে।

—তোকে যখন বলেছিল, পরিষ্কার করে দিতে পারিস্‌ নি ?

কালী কোন জবাব দিল না, নিজের মনে যাঁতা ঘুরাতে লাগ্‌লো।

পাঁচকড়ি নবীনের সঙ্গে কালীর বিয়ে দিল। কিন্তু কেন দিল সে কথা গ্রামের লোক না জান্‌লেও কালীর মা জানে। নেশাখোর মানুষ। মন খুব শাদা। তুঃখের সংসার। সময় অসময়ে টাকাটা সিকেটা সাহায্য পাওয়া যাবে। আর চরিত্র দোষ? পুরুষ বেটাছেলের ওটা কিছুই নয়। তু'দিন পরে শুধ্‌রে গেলে কালীর ভাগ্যে গাঁয়ের লোকের চোখ টাটাবে। এই কথাটা সে কালীকেও শুনিয়ে শুনিয়ে বল্‌তো। কালী কোন জবাব দেয় নি। আর দেবেই বা কি করে। জন্মেছে পাড়াগাঁয়ের চাষীর ঘরে। পিতার স্বামী নির্ব্বাচনে আপত্তি জানান তার কল্পনার অতীত। কিন্তু বাঁশবাগানে জন্মালে কি হয়? সেও ত একটা মানুষ। একটা পছন্দ অপছন্দও ত তার আছে। মাস আষ্টেক আগে তার খেলার সাথী শিবির বিয়ে হ'ল। বর

লেখাপড়া জানে না, লাঙ্গল চষে। তবে ভাল মানুষ, দেখ্‌তে ভাল, স্বভাব চরিত্রেও ভাল। উনিশ কুড়ি বছরের হৃষ্টপুষ্ট যুবক। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ষোল কলায় পূর্ণ। দেখে কালী বলেছিল, ভাই, তোর বেশ বর হয়েছে। কাজেই এখন তার মনের ভাব কিরূপ বোঝা কঠিন নয়। বিয়ের পর থেকেই সে গম্ভীর। অন্তরের অন্তস্তলে তার কতখানি দুঃখ তা' সে প্রকাশ করে না, নির্ব্বাক্ পশুর মত মুখ বুজে থাকে।

কবে নবীন শোধ্‌রাবে, কবে কালীর ভাগ্যে গ্রামের লোকের চোখ টাটাবে বিধাতাই জানেন। তবে যার বাবা না খেতে পেয়ে মারা গেল তার কাছ থেকে সাহায্যের আশা কি ক'রে করে, কালীর মা একবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে পাঁচকড়ি বলেছিল, বাবা আর বউ সমান নয়। তা' যদি হতো তোকে নিয়ে ভিন্ন হতাম না। আমি বউয়ের বাবা।

কিন্তু আজ যখন শ্রান্তক্লান্ত রৌদ্রদগ্ধ হয়ে মাঠ থেকে ফিরে শুন্‌লো, নবীন এসে পরের সদ্য-পরিষ্কৃত

উঠোন নষ্ট করে চলে গেছে, এখানে আসে নি, তখন সে রাগে দুঃখে ঘরের দেওয়াল হেলান দিয়ে বসে পড়ে বল্‌লো, হতভাগা মেয়েটা যদি ভাল হতো, জামাই শোধ্‌রাতে কি এতদিন বাকি থাক্‌তো। হতচ্ছাড়ী পারে কেবল পাথর পাথর গিল্‌তে আর হেবোর সঙ্গে কোঁদল কর্‌তে।

—এত উৎপাত কর্‌লে গাঁর লোক কি বল্‌বে? আজ ওরা জন পেয়েছে, ধান কাটা হচ্ছে। বেশ করে উঠোন গোবর দিয়ে ঘট পেতেছে, নতুন ধান আস্‌বে বাড়ী। ও গিয়ে নোংরা করে দিল।

—ধরে আন্‌তে পার্‌লে না?

—গিয়ে কি দেখ্‌তে পেলাম! উঠে আবার কোন্ দিকে গেছে, কি, কলকাতায় চলে গেল কে জানে।

স্নানের তেলটা এগিয়ে দিয়ে কালী আবার পাড়ায় বেরুলো।

৩

হপ্তা তিনেক পরে একদিন পাঁচকড়ি কলকাতার হাট থেকে ফির্‌ছিল, স্টেশনে দেখে নবীন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—তুমি এখানে?

—আজ্ঞে আমি বাড়ী যাচ্ছি যে।

—চল।

পাঁচকড়ি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো। স্নান আহার সেরে নবীন দাওয়ার একধারে মাহুর পেতে বসে ছিল। রামেশ্বর বেড়াতে বেড়াতে এসে দেখেই বল্‌লো, নবীন দা যে।

—হ্যাঁ ভাই।

—কখন্ এলে?

—এই একটু আগে।

—থাক্‌বে ত দু' একদিন?

—না, থাক্‌বো আর কি করে', ছুটি ত নেই।

রামেশ্বর উঠে তার মাদুরে গিয়ে বসে বল্‌লো,

—এখন কত পাচ্ছ দাদা ?

—সে সব কথা আর জিগ্যেস করিস্‌ নে।

—বলোই না, শুনি।

—আগে যা এখনও তাই।

—কিছু বাড়ে নি ?

—বাড়বে ! চাকরি বজায় আছে এই ঢের।

পাঁচকড়ি রান্নাঘরে বসে তামাক খাচ্ছিল। হুঁকোটা এইবার রামেশ্বরের হাতে দিয়ে সে আবার রান্নাঘরে গিয়ে ঢুক্‌লো। রামেশ্বর কলকেয় ফুঁ দিয়ে নিয়ে তামাক টান্‌তে টান্‌তে বল্‌লো,

—এইবার তা' হলে বাড়ীঘর সারিয়ে ফেল, বিয়ে-থাওয়া কর্‌লে—

—হাঁ সারাবো, গোয়ালঘরটা ছাইতে হবে, পাঁচীরটা ঠিক করে' উঠোনটা সাফা কর্‌তে হবে। আজকাল খড়ের দর কত ?

—বড্ড দর, ষোল টাকা কাহন।

—তা' হোক্‌, কত টাকা আর লাগ্‌বে ?

—তবে, ছেলে মানুষ কালী একলা কি করে থাক্‌বে, এখন তোমাকে বাড়ী থেকেই যাতায়াত কর্‌তে হবে।

—তা' হবে বৈ কি, অন্ততঃ গরমকালটা, শীতকালে পার্‌বো না, তখন এঁরাই দেখ্‌বেন।

—তুমি নেশাটা ছাড়ো দিকি দাদা।

পাশের বাড়ীর ক্ষুদিরাম এসে দাঁড়ালো।

—আয় ক্ষুদিরাম, উঠে এসে বোস্‌, নবীন বল্‌লো।

ক্ষুদিরাম উঠে মাতুরে গিয়ে বস্‌লো।

—আমার কথার জবাব দিলে না?

"নেশা?" বলে' নবীন নিঃশব্দে একটু হাস্‌লো। তারপর বল্‌লো,

—একটু না খেলে লোহা-ঠ্যাঙানো কাজ করা যায় না।

—বাজে কথা।

—বাজে কথা নয় রামেশ্বর, খোঁজ নিলে দেখ্‌বে, সব শালা মিস্ত্রিই মদ খায়।

—থামো থামো।

—আবার থামো।

—বাড়ানো কথা।

—একটুও বাড়ানো কথা নয়, রামেশ্বর।

—তা' হলে ও কাজ কেউ কর্‌তে যেতো না।

—কর্‌তে যায়, বেশী লোকই যায়, এই দিকেই আজকাল ঝোঁক বেশী, তবু আমার কথা মিথ্যে নয়। সারাদিন রুদ্ধ বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে আগুনে পুড়ে, উকো ঘসে, লোহা ঠেঙিয়ে এসে সন্ধ্যেবেলা মদ খেয়ে ক্লান্তি দূর করে।

—তুমি ত অবাক্ করে দিলে।

নবীন তার কথা কানে না তুলে বল্‌লো,

—পয়সা না থাক্‌লে কি হয়, সংসারে তোরা যে কাজ করিস্, তাই সব চেয়ে ভাল, সব চেয়ে পবিত্র। খোলা মাঠে ক্ষেতে বসে যখন তোরা কাজ করিস্, আর হুহু করে' হাওয়া তোদের গার ওপর দিয়ে বয়ে যায়, মনে হয় যেন ভগবানের আশীর্ব্বাদ তোদের গায় মাথায় ঝরে পড়্‌ছে।

মিনিট খানেক চুপ করে থেকে রামেশ্বর উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লো, বসো নবীন দা, আমাকে আবার মাঠে যেতে হবে, গরুগুলো বাঁধা আছে, নিয়ে আস্‌তে হবে।

একটু পরে নবীনও উঠে ক্ষুদিরামের সঙ্গে তাদের বাড়ীর দিকে গেল।

সন্ধ্যেবেলা পাঁচকড়ি দোকান থেকে ছুটো কাগজের ঠোঙা হাতে করে বাড়ী এসে বল্‌লো, নবীন কোথায় গেল?

কালীর মা বল্‌লো,

—ক্ষুদিরামদের বাড়ী আছে বোধ হয়।

পাঁচকড়ি ক্ষুদিরামের বাড়ী গিয়ে তাকে দেখ্‌তে পেল না।

—কই, সেখানে ত নেই।

তারপর সারা গাঁ খুঁজে তাকে আর পাওয়া গেল না।

৪

কালীর মা ঘরের চালের বাখারি ধরে চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল। পাঁচকড়ি বিচালি কাট্‌তে বস্‌লো। সন্ধ্যার আয়োজন করে' কালী তুলসী তলায় একটি প্রদীপ, শোবার ঘরে ও রান্নাঘরে এক একটি কুপি জ্বেলে দিল। সবাই চুপ চাপ। কারও মুখে কোন কথা নেই।

একটু পরে হাবু পাড়া থেকে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে তার মাকে জড়িয়ে ধরে বল্‌লো, মা ভাত খাবো।

তার হাত ছাড়িয়ে দিয়ে কালীর মা রান্নাঘরে গিয়ে উনুন ধরিয়ে দিল। সবে মাত্র চাল কটা ধুয়ে সে হাঁড়িতে চাপিয়ে দিয়েছে, এমন সময় ক্ষুদিরামের মা এসে বল্‌লো,

—দিদি, তোমার জামাই চলে গেল ?

—হ্যাঁ।

যে ছোট্ট কাঠের পিঁড়িটায় বসে কালীর মা কাজ কর্‌ছিল সেটি সে এগিয়ে দিয়ে বল্‌লো, বসো।

কিন্তু ক্ষুদিরামের মা বস্‌লো না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বল্‌তে লাগ্‌লো,

—বিয়ের পর একটা রাতও বাস কর্‌লো না গা —আর কর্‌বেই বা কি, যে ডাইনির হাতে পড়েছে। তারপর গলাটা একটু ছোট করে বল্‌লো, শুন্‌ছি নাকি এক গা গহনা। কালীর মা কোন সায় দিল না, তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ক্ষুদিরামের মা বল্‌তে লাগ্‌লো,

—আমাদের বাড়ী থেকে যখন উঠ্‌লো, তখন যদি জান্‌তাম চলে যাচ্ছে, তখনই খবর দিতাম, কে জানে বল!

শিল পেতে নিয়ে কালীর মা হলুদ ছেঁচ্‌তে বস্‌লো। ক্ষুদিরামের মা বল্‌লো,

—যাই, আমিও রান্না চাপিয়ে দিয়ে এসেছি। কাল মেয়েটা আস্‌বে। কখন্ পাঠাবে, সকালে কি বিকেলে, তার ঠিক নেই।

—কাল শিবু আস্‌বে?

—হ্যাঁ, অনেক দিন গেছে, একবার নিয়ে আসি,

হয়েছে কি, কারও কোন আপত্তি নেই, কেবল জামাই-ই পাঠাতে চায় না। আর তোমার দেওরও তেমনি, হাসে আর বলে, তবে থাক্, কি হবে নিয়ে এসে।

ঐ জামাই নিয়েই লোকে গুমোর করে। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস কালীর মার ভেতর থেকে বার হয়ে গেল।

বেলা ন'টা কি সাড়ে ন'টা হবে। স্থমুখের মাঠে শীতের রোদ ঝল্‌মল্‌ কর্‌ছিল। প্রকাণ্ড মাঠ সবুজ রবিশস্যে ভরা। এখানে এই কালীদের বাড়ীর স্থমুখ থেকে দূর সীমান্তবর্ত্তী ঐ গাছগুলি পর্য্যন্ত একেবারে একটানা সবুজ ক্ষেত। যবের শীষ, গোলাপী রঙের ফুলে ভরা মটরের গাছ খোলা হাওয়ায় দুল্‌ছিল। ঐ গাঁয়েই ত শিবির শ্বশুর-বাড়ী। এই মাঠের রাস্তা দিয়েই ত সে আজ আস্‌বে গরুর গাড়ীতে চড়ে। কালী দুবার মাঠের দিকে তাকালো। "ওমা, শিবি আস্‌ছে, ঐ ছাখ্‌,"

তৃতীয় বার মাঠের দিকে চেয়ে একটা গরুর গাড়ী আস্‌তে দেখে সে চীৎকার করে মাকে বল্‌লো। মা একবার উঁকি দিয়ে নিজের কাজে চলে গেল। কিন্তু গাড়ীটা একটু কাছাকাছি এলে কালী দেখ্‌লো সেটা ছইয়ে গাড়ী নয়। কা'দের একটা কাঠের গাড়ী ওপাড়ার দিকে চলে গেল।

তারপর শিবি যখন এলো, পাড়ার মেয়েরা সবাই এলো দেখ্‌তে। কালীর মাও গিয়ে দাঁড়ালো, কিন্তু কালী গেল না। নরুণ বার করে ঘরের কোণে নখ কাট্‌তে বস্‌লো। হাবু চিড়ে মুড়কি খেতে খেতে এসে বল্‌লো,

—দ্যাখ্‌ দিদি, কতগুলো দিয়েছে।

—তাই ত রে।

—তুই গেলিনে কেন, তা' হলে তোকেও দিত।

একটু পরে শিবি এল। লাল পেড়ে নতুন সাড়ী পরনে। কালী দেখে' অবাক্‌। এক বছরে এত বড় হয়েছে। যেন দুটো ছেলের মা। বুক মুখ প্রকাণ্ড বড়। লম্বায় চওড়ায় তার ডবল।

—তুই যে মাগী হয়ে গেছিস্।

চকিতে একবার এদিক্ ওদিক্ চেয়ে শিবি বল্‌লো,

—তুই বরের ঘর কর্‌বিনে ত মাগী হবি কি করে', ছুঁড়ী হয়েই থাক্‌বি।

—এখন তোকে দিদি বলে ডাক্‌বো।

—তাই ডাকিস্।

৫

হপ্তাখানেক পরেই শিবির বর এল। কালীর সহজ চলাফেরায় বাধা পড়লো! দিনগুলো বেশ কাটছিল ভাল, শিবিকে নিয়ে মাসীদের ক্ষেতে বেগুন তুলে, রামেশ্বরদের ঘরের পিছনের জমিতে ছোলার শাক তুলে, নিমাইদের বাড়ীর উঠোনের গাছে ঠেঙিয়ে কুল পেড়ে, আর সন্ধ্যেবেলা শিবির মার উনুনের পাশে বসে' গল্প শুনে'। আজ কথা ছিল, এক রাজার চার পুত্তুর গল্পটা হবে। কিন্তু হ'ল না! তেমন গুরুগম্ভীর সম্বন্ধ নয়, ঠাট্টা চালাকির সম্বন্ধ। তবু কালীর বাধো বাধো ঠেক্‌তে লাগ্‌লো। শিবির বরের সুমুখে বার হতে পার্‌লো না। তা' ছাড়া শিবির মাও খুব ব্যস্ত জামাইয়ের খাওয়া-দাওয়ার জোগাড়ে। তাদের ক্ষেত থেকে পালং শাক নিয়ে গেছে।

পরদিন দুপুর বেলা শিবির মা কালীর মাকে বল্‌লো, দিদি দুটো চাল কুট্‌বো, দু'খানা সরু চুকলি,

৬

দুটো পুলি পিঠে ছেলেটাকে গড়িয়ে দেব। কালীও খাবে আমাদের বাড়ী রাত্তিরে! এখন ডাক্‌তে এসেছি, একটু কাজ করিয়ে নেব।

—যাক্‌।

প্রায় ধামাখানেক চাল ঢেঁকিতে কুটে গুঁড়ো কর্‌তে সারা বিকেল গেল। সন্ধ্যার পর অন্যান্য আয়োজন করে নিয়ে উনুন জ্বাল্‌তে বেজে গেল প্রায় আটটা। সমস্ত শেষ হ'তে অনেক রাত হয়ে যাবে, তাই এটা ওটা সেটা কিছু কিছু করে' নিয়ে শিবির মা জামাইকে দিল খেতে। জামাইয়ের খাওয়া হলে শিবিকে বল্‌লো, তুই খেয়ে নে।

—নেবে খেয়ে, কালীদি থাক্‌লো বসে, আমি খেয়ে নেব।

—এই ক'টা হয়ে গেলে কালীকেও দেব, হাবুর জন্যেও দুটো নিয়ে যাবে'খন, তুই বোস্‌ ঐ পাতে।

শিবির ইচ্ছে না থাক্‌লেও শিবির মা তাকে জোর করে বসিয়ে দিল। খাওয়া হলেই বল্‌লো, যা, শুগে যা।

বেশ কথা, কালী কাজ কর্‌তে থাক্‌লো, আর আমি গিয়ে শুয়ে পড়্‌বো।

ইতস্ততঃ কর্‌তে দেখে শিবির মা জোর করে' তাকে জামাইয়ের ঘরে দিয়ে এলো।

তুপুর রাত্রে কাজ সব শেষ হ'লে কালী খেয়ে-দেয়ে হাবুর জন্যে এক থালা নিয়ে শিবিদের দক্ষিণ-তুয়ারী ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখ্‌লো তখনও ঘরে আলো জ্বল্‌ছে, আর শিবিরা ফিস্ ফিস্ করে গল্প কর্‌ছে।

বাড়ী অন্ধকার, সকলেই শুয়ে পড়েছে। কালীও আলো জ্বাল্‌লো না। থালাটা এক কোণে রেখে দিয়ে হাবু যেখানে ছিল সেখানে শুয়ে পড়লো।

—কে রে, দিদি নাকি?

—হ্যাঁ, তুই এখনও জেগে আছিস্?

—তুই পিঠে এনেছিস্?

—এনেছি, কাল সকালে খাস্।

হাবু আর কিছু বল্‌লো না। কালীও ঘুমিয়ে

পড়লো। কিন্তু একটু পরেই পিঠে আঙ্গুলের চাপে তার ঘুম ভেঙে গেল।

—দিদি একটু জল দিবি, খাব?

—দে দে, কি এনেছিস্ দে, না খেলে ওর ঘুম আস্‌বে না।

মা এখনও জেগে, অথচ সাড়া দিচ্ছে না। কালী যেন একটু আশ্চর্য্য হ'ল। উঠে কুপিটা জ্বেলে হাবুকে খেতে দিয়ে বল্‌লো, ওর হয়ে গেলে আলোটা নিবিয়ে দিও মা, আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে।

সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর যেই শুলো সেই ঘুমিয়ে পড়লো। পরদিন কালীর মা বল্‌লো, কি রাঁধি বল্ দেখি, পালং শাক যে কটা ছিল কাল শিবির মা কেটে নিয়ে গেল, যা, ছুটো ছোলার শাক তুলে নিয়ে আয়গে।

কালী শিবিকে বল্‌লো, যাবি, শাক তুল্‌তে যাবি?

শিবি রাজী ছিল, তার মা জান্‌তে পেরে নিষেধ

কর্‌লো। কালী একাই গেল। শাক নিয়ে ফিরে এসে দেখ্‌লো শিবি স্নান করে', ফর্সা একখানা কাপড় পরে' তাদের রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। সে ঘরের মেঝেয় শাকগুলো ঢেলে দিলে শিবি বল্‌লো,

—কুটে দেব জেঠি, দেব শাক কুটে? তুই যা স্নান কর্‌গে যা দিদি, আমি কুটে দিচ্ছি।

বলে' নিজেই ঘরের কোণ থেকে বঁটি নিয়ে এসে শাক কুট্‌তে বস্‌লো।

সেই দিনই বিকেলে জামাই চলে গেল। ফুরসত পেয়ে শিবির মা পা ছড়িয়ে বসে খুব খানিক গল্প করে গেল। জামাইয়ের গল্প। আর শিবি?

—চল্‌ কালীদি, মণ্ডলদের গাছ থেকে কুল পেড়ে আনি। এক হাতে আঁকৃশী আর এক হাতে কালীর বাঁ হাতখানা ধরে প্রায় ছুট্‌তে ছুট্‌তে শিবি চলে গেল।

কালীর সহিত তার মেশামিশিটা আগের

অপেক্ষা বেশী দেখা গেল। কুল বেল পেড়ে, রাস্তাঘাটে পাড়ায় পাড়ায় বেড়িয়ে, সন্ধ্যের পর কালীর মা রান্না চাপিয়ে দিলে উনুনের পাশে বসে' গল্প করে' যেন তার পোষায় না। সারাক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে। কাজের দরকার হ'লে মা ডাকে, সে গ্রাহ্য করে না। কিন্তু কালী এতে খুসী না হ'য়ে বিরক্ত হ'ল। সে যেন বুঝ্‌তে পার্‌লো নিজের জন্যে নয়, তার জন্যেই ওর এত বাড়াবাড়ি। কেন কি হয়েছে তার ?

—আয় দিদি, আমাদের বাড়ী।

—কেন ?

—তুই আয় না।

শিবি তাকে নিয়ে গিয়ে বঁটি আর মোটা মোটা দুটো মূলো বার কর্‌লো।

—ক্ষিধে পেয়েছে, দুটো মূলো খাওয়া যাক্।

বেশ করে ছাড়িয়ে, কুচি কুচি করে কেটে, খান কয়েক কালীকে দিয়ে নিজে একটা মুখে পুরে দিল। কস্ কস্ করে চিবাতে চিবাতে বল্‌লো,

তোর বর একবার এল না, এলে পরে এমন করে' শুনিয়ে দিতাম যে, কথার চোটে তার নেশা ছুটে যেত।

আর খাবো না, ভাল নয়, বড্ড ঝাল, বলে' থালা থেকে আর তু'খানা তুলে নিয়ে খেতে খেতে কালী বাড়ী চলে এলো।

কেটে গেল পৌষ মাস মাঘ মাস। ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি শিবি আবার চলে গেল শ্বশুর-বাড়ী। এখন সুমুখের সবুজ মাঠ সাদা হয়ে গেছে। ফসল উঠেছে পেকে। কতক এরই মধ্যে উঠে গেছে খামারে। কোথায়ও দল বেঁধে চাষীরা পাকা মুসুরির গাছ উপড়াচ্ছিল! কোথায়ও হচ্ছিল গাড়ী বোঝাই। কোথায়ও খামারে চার পাঁচটা গরু পাশাপাশি জুড়ে যব মাড়া হচ্ছিল! শুকনো যবের গাছ গরুর ক্ষুরে গুঁড়ো হয়ে উড়ে চারিদিকে করেছিল কুয়াশার সৃষ্টি। বোঝাই গাড়ীর যাতায়াতে মাঠের পথটিও হয়ে উঠেছিল অধিকতর স্পষ্ট ও ধূলিময়। মাঠের মধ্য দিয়ে শিবির ছইয়ে গাড়ী

গ্রাম্য বালিকা

সেই পথেই চলে গেল সুমুখের গ্রামে। বয়সে ছোট হ'লেও যেন সে জীবনের পথে তার চেয়ে এক পা এগিয়ে গেল। যখন গাড়ী আর দেখা গেল না তখনও কালী চেয়ে রইল সেই দিকে। অবশেষে তার অন্যমনস্ক দৃষ্টি গিয়ে পড়্‌লো নিকটস্থ শিমূল গাছটির উপর। ফুলে ভরা ছত্রাকার বৃক্ষটি মাঠের মধ্যে যেন আবির মেখে দাঁড়িয়ে আছে।

৬

শিবি চলে গেল। বসন্তের মধুর আবহাওয়াটুকুও যেন সঙ্গে করে' নিয়ে গেল। গভীর রাত্রে অকস্মাৎ বৃষ্টি এলো। এক মুহূর্তে সুপ্ত গ্রাম উঠ্‌লো জেগে। ছেলে ডাক্‌লো বাবাকে, বাবা ডাক্‌লো ছেলেকে। দাদা ডাক্‌লো ভাইকে, ভাই ডাক্‌লো দাদাকে। যার ডাক্‌বার কেউ নেই তার ঘুম ভাঙ্‌লো প্রতিবেশীর হাঁকডাকে। সবাই ছুটলো মাঠে। ক্ষেতখামার সব একাকার হয়ে আছে। ভিজে গেলে সব পচে নষ্ট হ'য়ে যাবে। এ বছরটাই হবে মাটি। দশ-পনর মিনিট বৃষ্টি পড়ে বন্ধ হ'য়ে গেল। আবার এখনই পড়্‌তে পারে। ঘন মেঘে আকাশ কালো হ'য়ে আছে। কালী উঠানে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লো অন্ধকার মাঠে হারিকেন ও মশালের আলোগুলো ঠিক যেন আলেয়ার মত ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। তার ইচ্ছে কর্‌তে লাগ্‌লো, ছুটে গিয়ে বাবার কাজে সাহায্য করে। ভগবান যদি তাকে বেটা ছেলে করে পাঠাতেন।

সকালে রোদ উঠ্‌লো না। সমস্ত দিন ধরে মেঘলা হাওয়া দিয়ে সন্ধ্যে থেকে আবার বৃষ্টি পড়্‌তে লাগ্‌লো। আকাশ পরিষ্কারের কোন লক্ষণ নেই। রাত্রে ক্ষুদিরামের বাড়ীতে অনেকে এসে বসে, তাস খেলে। সেদিনও অনেকে এলো, কিন্তু তাস খেলা আর হ'ল না। রবি শস্যের নাম করে' তারা জমিদার মহাজনকে ঠেকিয়ে রেখেছে। উপরি উপরি দু'বৎসর ধান ডুবে গেছে। একটা শীষও ঘরে তুল্‌তে কেউ পারেনি। কোন রকমে দুটো চাল সংগ্রহ করে' না ফির্‌তে পার্‌লে অনেকের উনুনে হাঁড়ি চড়ে না। তার উপর যদি এ ফসলটাও নষ্ট হয়ে যায়, জমিদার মহাজনকেই বা কি দেবে আর নিজেরাই বা কি খাবে। আর সুমুখের বৈশাখী চাষ, ধান পাটের বীজই বা কি করে' সংগ্রহ কর্‌বে। ভাবনায় পেটের ভাত তাদের চাল হ'য়ে যাচ্ছিল।

বাদলা কাট্‌লো না দেখে' অনেকে সেই ভিজে গাছই কিছু কিছু গাড়ী বোঝাই করে'

নিয়ে এসে যার যেখানে একটু জায়গা ছিল, কেউ চণ্ডীমণ্ডপে, কেউ ঢেঁকিশালায়, কেউ শোবার ঘরের মেঝেয় ছড়িয়ে দিল, যদি হাওয়ায় শুকায়, কিন্তু শুকালো না, বরং বদ্ধ ঘরের মধ্যে পচে বাড়ীময় একটা বিকট তুর্গন্ধ ছড়িয়ে দিল।

চারদিন পরে সূর্য্যদেব দেখা দিলেন। নবীন আলোকে বসন্তের নূতন পৃথিবী আবার হেসে উঠ্‌লো। কিন্তু সে হাসি কেশবপুরবাসিগণের নিকট বিদ্রূপের হাসি। সকালে উঠেই পাঁচকড়ি খামারে গিয়ে দেখ্‌লো মুসুরি গাদার মাথা দিয়ে ধোঁয়া উঠ্‌ছে। খুব চেপে চেপে গাদা দেওয়া ছিল। ভিতরে জল বসে গরম হ'য়ে গ্যাসের সৃষ্টি করেছে। মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে' পাঁচকড়ি গাদা ভেঙে খামারময় ছড়িয়ে দিল।

কিন্তু যা' নষ্ট হ'য়ে গেছে তা' কখনও আর ভাল হয় না। রোদ লেগে ঘণ্টা তুয়ের মধ্যে হাজা মুসুরির গাছ পোড়া কয়লার মত কালো হয়ে গেল! কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পাঁচকড়ি একটা বাব্‌লা

গাছের ছায়ায় গিয়ে বস্‌লো। বসে' বসে' ভাব্‌তে লাগ্‌লো। তিন বছর আগে মা মারা গেলে লোকের কথায় সে দু'শ টাকা ধার করেছিল। তখন সবাই বলেছিল, টাকা জীবনে কত হবে, কিন্তু মা ত আর হবে না, ভাল করে শ্রাদ্ধ কর্‌বি বৈকি। কিন্তু তিন বছরের মধ্যে একটা পয়সাও সে শোধ দিতে পারে নি। সুদ বেড়েই চলেছে। তার ওপর জমিদারের খাজনা বাকী। সংসার খরচের জন্যে দু'টাকা এক টাকা করে' করে' এমন লোক নেই যে তার কাছে ধার করেনি। এখন তার বাঁচ্‌বার একটিমাত্র পথ, জমি-জায়গা গরু-বাছুর বিক্রী করে দেনা মিটিয়ে পরের বাড়ী জন খাটা। কিন্তু সেও তার পক্ষে মৃত্যুর সামিল। গামছাটা মাথায় জড়িয়ে পাঁচকড়ি উঠ্‌লো! বেলা তখন বারটা কি একটা। বাড়ী গিয়ে দেখে ঘরের দাওয়ার উপর বসে' নবীন। ফর্সা ফতুয়া গায়, তেড়ি কাটা, বসে' বসে' পান চিবাচ্ছে। পাঁচকড়ি দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে' মাথার গামছাটা কাঁধে রেখে বল্‌লো,

—আজ আবার কারও বাড়ী গিয়ে উঠেছিলে নাকি ?

—না, সোজা এখানেই আস্‌ছি, কেন ?

—কেন বুঝ্‌তে পার্‌লে না ? অত বুদ্ধি থাক্‌লে আর—

—কি, হয়েছে কি ?

—হ'বে আর কি, বিয়ে কর্‌লে খেতে দিতে হয় বুঝ্‌তে পার ?

কি কথায় কি কথা এসে পড়্‌লো দেখে নবীন অবাক্ হ'য়ে গেল।

—আমি ভাত-জল দিয়ে পুষ্‌বো বলে তোমার হাতে মেয়ে দিইনি।

—আমিও দেবার জন্য সাধাসাধি করি নি।

পাঁচকড়ি ক্ষিপ্র হ'য়ে উঠে বল্‌লো,

—ঘর তুলে মেয়ে নিয়ে যেতে পার ত এসো, নতুবা আর কখনও আমার বাড়ী এসো না, এ গাঁয়েও না।

—বেশ, আস্‌বো না,

বলেই নবীন উঠ্‌লো।

"তুমি কি বল্‌ছ কি" বলে কালীর মা রান্নাঘর থেকে ছুটে এসে নবীনের হাত ধর্‌লো।

নবীন হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। তবু কালীর মা কিছুদূর পিছনে পিছনে ডাক্‌তে ডাক্‌তে গেল। কিন্তু সে ফির্‌লো না।

কালীর মা ফিরে এসে দেখে, পাঁচকড়ি গামছাটা মাথায় দিয়ে দাওয়ার মাটিতেই শুয়ে পড়েছে। হাবু একটা সজিনার ডাঁটা উঠানে এনে ফেলেছিল, সেটা রান্নাঘরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে বল্‌লো,

—মাঠ থেকে যেন আগুন হ'য়ে এলে।

পাঁচকড়ি একবার ফিরে চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল।

—এখন রাগ কর্‌তে লজ্জা করে না? গ্রাম-শুদ্ধ লোক যে তখন বারণ করেছিল। দশজনের কথা না শুন্‌লে এই রকমই হয়।

—তুই উল্টো বল্‌ছিস্‌। দশজনের কথা শুন্‌লেই এ রকম হয়। যদি আমি না শুন্‌তাম,

তা' হ'লে আজ আমিও ডুব্‌তাম না, মেয়েও জলে পড়্‌তো না। চাষা আমাদের আর বলেছে কেন!

কালীর মা গুম্ হ'য়ে বসে রইলো। রান্নাবাড়া হ'ল, অথচ ছেলেটা ভর দুপুর বেলা না খেয়ে চলে গেল।

বাকি রান্নাটুকু শেষ করে' কালী ডাক্‌লো,

—বাবা ওঠ, কত বেলা হয়ে গেছে, স্নান কর।

পাঁচকড়ি উঠে বস্‌লো।

আর ওদের বাড়ী যেতে হবে না, আমি জল এনে দিচ্ছি, বাড়ীতে স্নান কর।

নাওয়া শেষ করে পাঁচকড়ি খেতে বসে বল্‌লো,

—হাবু কোথায়?

—সে খেয়েছে। আজ সে কি ক'রেছে জান? সকালে কোথা থেকে আম কুড়িয়ে এনে গোয়াল ঘরের মধ্যে লুকিয়ে খাচ্ছিল। যেই বলেছি কি করছিস্ রে, সেই ঢেলাবন, কাটাবন ভেঙ্গে সোজা মাঠে মাঠে দৌড় দিল,

বলেই কালী খিল খিল করে হেসে উঠ্‌লো।

৭

সুরু হ'ল চৈত্রের তপ্ত হাওয়া। মার্ত্তণ্ডের রুদ্র রূপ গলে' গলে' পড়্‌তে লাগ্‌লো। মাঠের দিকে তাকায় কার সাধ্য! দিগন্তব্যাপী শাদা ঢেলার রাশি খাঁ খাঁ কর্‌ছে। ঘাসগুলো শুকিয়ে লাল্‌চে রাঙা হয়ে গেছে। খাল বিল ডোবা সব শুক্‌নো খট্‌খটে। নগ্ন প্রকৃতির এ যেন একটা বিকট-দর্শন কঙ্কালমূর্ত্তি। নষ্টসর্ব্বস্ব কৃষক ভবিষ্যতের আশায় বুক বেঁধে আবার লাঙ্গল ধরেছে। ঝল্‌সানি উত্তাপ তার গায়ে লাগে না। দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ কর্‌ছিল। কালীর মা রান্নায় ব্যস্ত। হাবু বসে' ছিল কাছে ভাতের আশায়। কালী জ্বালানি কাঠ নিতে এসে বাইরের বাড়ীর গোয়াল ঘরের চালের বাখারি ধরে' দাঁড়ালো। একটা দাঁড়কাক নিকটের বাব্‌লা গাছে বসে' অবিরাম ডেকে চলেছিল। চারিদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে তার স্বর গুরুগম্ভীর হ'য়ে কাণে লাগ্‌ছিল। ছুটতে ছুট্‌তে এসে সদ্য হলমুক্ত

কাদের একটা গরু সুমুখের নাদায় মুখ ঘসে চলে গেল। জল খাবে। আরও দু'তিনটি গরু নাদায় উঁকি দিয়ে গেল। তৃষ্ণায় তাদের মহাপ্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছে। এখনই তাদেরও গরু বাড়ী আস্‌বে। কলসী দুই জল এনে রাখ্‌তে পার্‌লে হ'ত। কিন্তু কোথা থেকে আন্‌বে! ক্ষুদিরামদের কুয়োয় এখন ঘটি ডুব্‌ছে না। সন্ধ্যের আগে জল পাবার আশা নেই। কাঠ ক'খানা রান্নাঘরে দিয়ে একটা কলসী কাঁখে আর একটা হাতে নিয়ে কালী ওপাড়ায় চলে গেল।

শব্দ পেয়ে বীরুর মা ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

—হ্যাঁ, যেটুকু হ'য়েছে বেশ ক'রে তুলে নিয়ে যা। আমাদের গরু লাঙ্গল ব'য়ে এসে শুকিয়ে থাক্‌বে 'খন। কালীর তখন একটি কলসী ভর্ত্তি হ'য়ে গেছে। হাস্‌তে হাস্‌তে সে অন্য কলসীটি নামিয়ে দিল।

—তোর একটা আক্কেল নেই, এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় এসেছিস্ জল নিতে!

কূপের মধ্যে দৃষ্টি রেখে কালী আগের মত হাস্‌তে লাগ্‌লো।

—তোর বর তো চাকরী করে, বল্‌তে পারিস্‌নে একটা কুয়ো কেটে দিতে? না পারিস্‌ আমি বল্‌বো। এবার দেখা হ'লেই বল্‌বো, তোর বউ বাড়ী বাড়ী জল কুড়িয়ে বেড়ায়, একটা কুয়ো কেটে দিয়ে যা।

হঠাৎ কালীর হাসিমুখ কঠিন হ'য়ে গেল। তোলা জল ঢেলে দিল তাদের নাদায়। বীরুর মা অবাক্‌ হ'য়ে গেল। শূন্য কলসী হাতে কালী যখন দৃষ্টি-পথের বাইরে চলে গেল তখন বল্‌লো, যা, জল না নিয়ে গেলি ত আমার কি?

কালী ফিরে এসে দেখ্‌লো, তার বাবা মাঠ থেকে এসে ঘরের দাওয়ায় মাটিতে শুয়ে আছে, গরু দুটো ধুক্‌ছে গোয়ালের মধ্যে।

পাঁচকড়ি ঘাড় ফিরিয়ে দেখে বল্‌লো, জল পেলিনে?

—না।

এক ঘড়া জল ঘরে তোলা ছিল, তাই দিয়ে কোন রকমে কাকস্নান সেরে পাঁচকড়ি খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়্‌লো। কালী ও কালীর মা খেতে বস্‌বে, এমন সময় নবীন কোথা থেকে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে এসে বল্‌লো,

—মা, আমার বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে, ভাত থাকে ত দাও।

বিস্ময়ে আনন্দে কালীর মার বাক্‌-রোধ হ'য়ে গেল। অপলক চোখে সে কালীর মুখের পানে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। এত শীঘ্র তার আগমন সে প্রত্যাশা করেনি। আর এর আগে সে এমন করে' কখনও ডাকেওনি।

তাড়াতাড়ি সে নিজের ভাতগুলি জামাইকে বেড়ে দিল।

গলার আওয়াজ পেয়েই পাঁচকড়ি বুঝ্‌তে পেরেছিল। কিন্তু সে উঠ্‌লো না। একবার ফিরে চেয়ে আগের মত চোখ বুজে পড়ে রইলো।

কিন্তু পাড়ার লোক যেন লুকিয়ে থাকে। নবীন সবে খেতে বসেছে, শিবির মা এসে বল্‌লো,

—তোর জামাই এসেছে বুঝি! তা' বেশ। নেশাখোর মানুষ, ওদের মন খুব সাদা।

হঠাৎ রাগে কালীর মার ভেতরটা জ্বলে উঠ্‌লো। তবে, সে চুপ করে রইলো। এ সব কথা তাকে শুনতেই হবে।

—কি দিয়ে ভাত দিলি?

—কি দিয়ে আর দেব, যা রান্না হয়েছে তাই দিয়ে।

"তরকারী না থাকে আমাদের বাড়ী থেকে নিয়ে আয়" বলে' শিবির মা কালীর মুখের দিকে চাইল। কিন্তু কালী নড়্‌লো না দেখে নিজেই এক বাটি তরকারী নিয়ে এসে নবীনের পাতের কাছে রাখ্‌লো।

ক্রমে বেলা পড়ে এলো। গোয়াল ঘরের ছায়া দীর্ঘতর হ'য়ে উঠানের অর্দ্ধেকখানি জুড়ে নিল।

রোদের তেজ কমে গেছে অনেক। ঝির-ঝিরে হাওয়ায় সুমুখের নিম গাছের পাতাগুলো কাঁপ্‌ছিল। পাঁচকড়ি ঘুম থেকে উঠে কালীকে বল্‌লো, মা আর একবার জলের চেষ্টা দেখিস্‌। তারপর সে গরু ছুটো বার করে নিয়ে মাঠের দিকে চলে গেল। কালীর মেসো বীজের যোগাড় করে দেবে বলেছে। ভাল ভাবে ধান পাটের চাষ যদি কর্‌তে পারে মহাজন কি আগামী ফসল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌বে না—অহরহই এই চিন্তা নিয়ে সে কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকে।

শিবিদের কুয়োয় হয়ত এতক্ষণ জল হয়েছে। কালী তাড়াতাড়ি কলসী নিয়ে গেল। নাদাটা ভর্ত্তি করে আরও ছু'কলসী জল অন্য খরচের জন্য এনে রেখে দিল। কালীর মা বল্‌লো,—রাত্রে কি রাঁধ্‌বো বল্‌ দেখি? হারুর পিসী ছুটো মুগের ডাল দিতে চাইলো, যা নিয়ে আয়। আমি উঠোন আর গোয়ালটা ঝাঁট দেই।

—আমি ঝাঁট দিচ্ছি, তুই কোথায় যাবি যা, বলে' কালী ঝাঁটা হাতে গোয়াল ঝাঁট দিতে গেল।

রাত্রে রান্না শেষ হ'লে শ্বশুর জামাই খেয়ে নিল। তারপর কালী ও কালীর মা খেতে বস্‌লো। পাঁচকড়ি তামাক সেজে নিয়ে গিয়ে অন্ধকারে উঠানের এক কোণে বসে টান্‌তে লাগ্‌লো। নবীন মিনিট পাঁচেক ঘোরাফেরা করে' গিয়ে শুয়ে পড়্‌লো।

কালীর মা নিজের তরকারিটুকু কালীর পাতে তুলে দিল।

—সব আমাকে দিলি ত তুই কি দিয়ে খাবি?

"তা হোক্, মা" বলে' বাটির ডালের অর্দ্ধেক কালীর পাতে ঢেলে দিল।

কালী খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠে গেল।

খাওয়া হ'লে মা ডাক্‌লো,

—কালি, ও কালি,

কালীর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

মা রান্নাঘরের কাজ শেষ করে' হাত-মুখ ধুয়ে ডাক্‌লো,—কোথায় গেলি, ও কালি?

তবুও কালীর সাড়া নেই।

কোথায় গেল, শুয়ে পড়্‌লো নাকি ? তা' কি পারবে প্রথম দিন। জানালা দিয়ে দেখ্‌লো নবীন একা শুয়ে আছে! পাঁচকড়ি অন্ধকার উঠানে বসে তখনও নিবানো হুকোটা টান্‌ছিল।

—কালী কোথায় গেল ?

—কোথায় গেল তা আমি কি করে' বল্‌বো ?

কালীর মা দাঁড়ালো না, শিবিদের বাড়ী গেল দেখ্‌তে। শিবির মা পা ছড়িয়ে বসে' ভাত খাচ্ছিল, বল্‌লো,

—কৈ কালী ত আসেনি।

কালীর মা আরও ক'বাড়ী ঘুরে এলো। কালীর দেখা পেল না। সত্যি, কোথায় গেল বল দেখি ছুঁড়িটা!

—আরে, পাড়াতেই কোথাও আছে, আস্‌বে এখন। অত ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন ?

তাই হবে, পাড়াতেই কোথাও আছে। কালীর মা একটু আশ্বস্ত হ'ল।

ক্রমে কথায় কথায় দুটি ঘণ্টা কেটে গেল।

রাত্রি গভীর হ'য়ে এলো। চারিদিক নিস্তব্ধ হ'য়ে গেল। কালীর মা বল্‌লে, তুমি কি বল্‌ছ এখনও সে পাড়ায় বসে আছে?

—তাই ত, তা' না হ'লে গেল কোথায়?

—যাবে আর কোন্ চুলোয়, এখানেই কোথায় লুকিয়ে আছে হতচ্ছাড়ি।

পাঁচকড়ি উচ্চৈঃস্বরে ডাক্‌লো, কালি, ও-কালি। পুরুষ কণ্ঠের গুরু আওয়াজে সমগ্র পল্লী ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌লো। কিন্তু কালী না এলো কাছে, না দিল সাড়া।

হারিকেন জ্বেলে কালীর মা আর একবার রান্নাঘর, গোয়াল, উঠান, শোবার ঘরের এ-পাশ ও-পাশ তন্ন তন্ন করে খুঁজ্‌লো। কোথায়ও তাকে পেল না।

—তুমি যাও ত ও-পাড়ায়, ওর মাসীর বাড়ী একবার দেখে এসো।

—তুই পাগল হয়েছিস্ নাকি, ছেলেমানুষ এই অন্ধকার রাত্রে যাবে ও-পাড়ায়!

—তুমি যাও শীগ্‌গীর, পাও যদি ত চুলের মুঠো ধরে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে আস্‌বে।

হারিকেনটা জোর করে সে পাঁচকড়ির হাতে গুঁজে দিল।

সরু পথ। দু'ধারে আগাছা-জঙ্গল। মাঝে মাঝে এক একটা খড়ের চালের বাড়ী আর মধ্যে ডুবে আছে। এক রকমের পোকা চিড়িক্‌ চিড়িক্‌ করে ডাক্‌ছিল। পাঁচকড়ি চলেছিল খুব দ্রুত। কালো কালো গাছের মাথা হারিকেনের আলো লেগে যেন ভূতের মত হেসে উঠ্‌ছিল। ওরে, বাপ্‌রে! একি! তার সুমুখ দিয়েই প্রকাণ্ড একটা সাপ রাস্তার এক ধার থেকে বার হ'য়ে আর এক ধারে চলে গেল। আচম্‌কা পাঁচকড়ির গা শিউরে উঠ্‌লো।

ডাকাডাকিতে বিপিনের ঘুম ভাঙ্‌লো।

—দাদা, এত রাত্রে কি মনে করে?

—কালী আছে এখানে?

—না।

—তাকেই খুঁজ্‌ছি।

—এত রাত্রে সে কোথায় গেল?

—কি জানি, খেয়ে উঠে কোথায় গেল, খুঁজে পাচ্ছিনে।

—মেরেছ টেরেছ নাকি?

—কিচ্ছু না, আর মার্‌বো কি, জামাই রয়েছে বাড়ী।

—না, সে ত আসেনি এখানে।

পাঁচকড়ি ফিরে এলো। রাগে দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়বার ইচ্ছা হ'তে লাগ্‌লো কালীর মার। এত দুঃখ তার কপালে ছিল, ভগবান্! সমস্ত রাতটা সে একবার উঠে একবার বসে কাটালো, ঘুমাতে পার্‌লো না এক মিনিটও।

এদিকে রাত্রি তৃতীয় প্রহরে বিপিনের ঘুম ভেঙ্গে গেলে সে উঠে বাইরে এলো। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ তখন সবে মাত্র উঠেছে। পূর্ব্বদিকের বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে আলো এসে দাওয়ার উপর পড়েছে।

বিপিন দেখ্‌লো ছোলার বস্তাটার পাশে কে কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

—কে শুয়ে, কালী নাকি?

—হ্যাঁ।

—যা, উঠে ঘরে গিয়ে শুগে।

সকালে মাসী তাকে সঙ্গে করে' নিয়ে গিয়ে রেখে এলো। কালীর মা ভাল মন্দ কিছু বল্‌লে না। কালীও আপন কাজে লেগে গেল। কিন্তু বেলা যত বাড়্‌তে লাগ্‌লো মাঁর মুখ তত ফুট্‌তে লাগ্‌লো। জামাই থেকে একটু দূরে দূরে আর মেয়ের একটু কাছাকাছি হ'লেই যা মুখে এলো তাই বল্‌তে লাগ্‌লো। বরের ঘরে যেতে লজ্জা করে, লোক হাসাতে লজ্জা করে না! এখনও খুকী আছিস্‌! দু' ছেলের মা হতিস্‌ এতদিন!

কালী নীরব নির্ব্বিকার। একটা উত্তরও দিল না। ভ্রূক্ষেপও কর্‌লো না। যেন কিছুই ঘটেনি। কাজ কর্‌লো, খেলো, দুপুরবেলা ঘুমালো। বিকেলে হাবু কোথা থেকে কাঁচা আম নিয়ে এসে ছেঁচে

নুণ মাখাচ্ছিল, সেও যোগ দিল তার সঙ্গে। তারপর সন্ধ্যেবেলা সাঁঝের বাতি জ্বেলে দিয়ে কোথায় ডুব দিল।

কালী কোথায় গেল, কালী কোথায় গেল, আর কালী কোথায় গেল! সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন করে' খুঁজেও আর তাকে পাওয়া গেল না। কালীর মা বুক চাপ্‌ড়ে বল্‌তে লাগ্‌লো, হতভাগীও আমাকে এম্‌নি করে জ্বালাবে! পাঁচকড়ি নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর ঘরের দেওয়াল হেলান দিয়ে বসে' বল্‌লো, যাক্‌ আজ আর খুঁজ্‌বো না।

পিছনে গোপালদের বাড়ী। উভয়ের জমির সীমানায় বাঁশের বেড়া। বেড়ার গায় কচু ও আশ্‌শেওড়ার জঙ্গল। ছোট একটি পেয়ারা গাছ সেই বেড়ার ধারে জঙ্গলের মধ্যে থেকে উঠে ডাল পালা ছড়িয়ে আছে। সাঁঝের আলো জ্বেলে দিয়ে কালী সেই গাছে উঠে বস্‌লো। এই কিছুদিন আগেও সে সন্ধ্যাবেলা পাড়ায় গেলে আলো ধরে এগিয়ে নিয়ে আস্‌তে হ'ত। আজ সে এই ঘোর

অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে গাছে উঠে বসে' আছে, মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল এত বড় একটা রাত।

ভোরের ক্ষীণ জোৎস্না উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই উষার আলোয় মিলিয়ে গেল। চারিদিক হয়ে গেল ফর্সা। কালী গাছ থেকে নেমে এসে উঠান ঝাঁট দিতে লাগ্‌লো। পাঁচকড়ি উঠেছিল আগেই। গরু দুটোকে খেতে দিয়ে যোয়ালে দড়ি জড়াচ্ছিল। লাঙ্গলে যাবে। পিছনে শব্দ পেয়েই সে পাঁচন হাতে এসে বল্‌লো,—কোথায় ছিলি রাত্রে?

কালী কোন জবাব দিল না।

—বল্‌ কোথায় ছিলি?

বলেই চীৎকার করে উঠে গোটা কয়েক পাঁচনের ঘা জোরে জোরে তার পিঠের ওপর বসিয়ে দিল। নিমাইয়ের ঠাকুরমা কোথায় যাচ্ছিল, দেখেই ছুটে এলো।

—আহা-হা সকাল বেলা মেয়েটাকে এত করে' মার্‌ছো কেন?

কালীর মা ঘর থেকে বেরিয়ে বল্লো·—

মার্‌বে না, সন্দেশ খেতে দেবে, হতচ্ছাড়ি কোথাকার! চেঁচামিচি শুনে শিবির মা এলো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আরও দু'চারজন বউ-ঝি-গিন্নী এসে দেখা দিল।

পাঁচকড়ি আর দাঁড়ালো না। লাঙ্গল গরু নিয়ে মাঠে গেল।

শিবির মা বল্লো—

তা তোর আক্কেলটাই বা কি, এখনও কি খুকী আছিস্?

—তুমি থাম।

—কেন, থাম্‌বো কেন?

—যে একজনকে নিয়ে ঘর-সংসার কর্‌ছে আমি তার ঘাড়ে চাপ্‌তে যাবো কেন?

—কে সে, তোর সঙ্গে হলো বিয়ে—

—কিসের বিয়ে?

সকলে অবাক্। বোবা মেয়ের মুখে এত কথা ছিল!

—আয়, কিসের বিয়ে দেখিয়ে দেই,

বলেই হাতের ঘটি দিয়ে কালীর মা আবার যেমনি তার পিঠে মেরেছে, সে ছুট্‌তে ছুট্‌তে পালিয়ে গেল। সোজা মাসীদের বাড়ী গিয়ে বল্‌লো,

—এবার যদি রেখে আসিস্‌, ত এ-দেশ-ছাড়া হ'য়ে চলে' যাবো, তারপর ঘরে গিয়ে মাদুর পেতে শুলো।

মাসী হাতের কাজ সেরে ঘরে গিয়ে দেখে, সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

৮

এদিকে নবীন অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লো মনে মনে। লজ্জায় তার মাথা কাটা যেতে লাগ্‌লো। এত কাণ্ডের পর আর কি এখানে থাকা যায়? আর না থেকে যাবেই বা কোথায়। তাই ভিতরে ভিতরে বিচলিত হ'লেও বাহিরে সে কিছুই প্রকাশ কর্‌লো না। খায়-দায় বেড়ায়, হাবুকে সঙ্গে নিয়ে দেড় ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটা গ্রামের বিলে যায় মাছ ধর্‌তে, কিন্তু সে দিনের একটা ঘটনা তার ধৈর্য্য একেবারে নষ্ট করে দিল। বিকাল বেলা বিপিন এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লো,

—তোমার এখন ছুটি নাকি?

—হ্যাঁ, কারখানা বন্ধ আছে।

—কেন?

স্ট্রাইক্‌ করেছে।

বিপিন বুঝ্‌তে না পেরে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

নবীন বল্‌লো,

—কুলিরা আর কাজে যায় না, ধর্ম্মঘট করেছে।

—কবে থেকে ?

—আজ প্রায় দু'মাস।

—কেন, কারণটা কি ?

—আগে কাজ ছিল না, পয়সা-কড়িও কিছু দিত না। এখন কাজ বেড়েছে, দিন-রাত কাজ চলেছে, তবুও কিছু দেয় না। খাটুনির অনুপাতে তারা খেতে পায় না। অন্যায় করেছে কি ?

—হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেও দুটো পেট ভরে খেতে পায় না, এ কি রকম কথা !

—তবে আমরা মিস্ত্রিরা এতে রাজী ছিলাম না। জোর করে, মারের ভয় দেখিয়ে দলে ভিড়িয়েছে। যাবার সময় বিপিন কালীর মাকে বলে' গেল,

—জোর-জবরদস্তি করে কোন ফল হবে না, কালী এখন কিছুদিন আমার ওখানেই থাক্।

গ্রাম্য বালিকা

গভীর রাত্রে নবীনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে এদিক্ ওদিক্ তাকালো। কিছুই দেখ্‌তে পেল না, ঘোর সূচিভেদ্য অন্ধকার। বাইরের বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে একটা সড়্ সড়্ শব্দ। কালী এখানে নেই, মাসীর বাড়ী। এখন কিছুদিন সে থাক্‌বে সেখানে। কিছুদিন, কতদিন? যতদিন সে থাক্‌বে এখানে? কথাটা শোনার পর থেকে তার অস্বস্তির মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। আর কি এখানে থাকা ভাল দেখায়? বিপিনের কথা বলার ধরণটাও অন্য রকম—"তোমার এখন ছুটি নাকি?" ধর্ম্মঘট মিটে গেলে চিঠি দেবে বলেছে। কিন্তু কবে মিট্‌বে? আবার যদি নতুন লোক নিয়ে নেয়? আমাদের মিস্ত্রিদের ওপর সাহেবের যে রাগ! আর ঘুম এলো না। বাকি রাতটুকু সে এপাশ ওপাশ করে কাটালো।

সকালে পাঁচকড়ি মাঠে চলে গেল। নবীন উঠে পূর্ব্বদিকের কলা ঝাড়টার কাছে দাঁড়ালো। সুমুখের জমিটা ফাঁকা। দূরে আকাশস্পর্শী বাঁশ

গাছের সরু সরু মাথাগুলো বাতাসে তুল্‌ছিল। যেন তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছিল। ও বাঁশ তাদেরই, তাদেরই ভিটের উত্তর দিকে ঐ বাগান। ধ্বক্‌ করে কে যেন তার বুকের ভেতর হাতুড়ির ঘা দিল। কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে এক পা এক পা করে সে সেই দিকেই অগ্রসর হলো। পোড়ো বাড়ীর চেহারা প্রাচীর চোখে পড়্‌তেই অন্তর তার কেঁদে উঠ্‌লো। ভেঙে গেছে। উঠানে ভীষণ জঙ্গল। গোয়ালের চাল পচে খসে শূন্যে ঝুল্‌ছে। ঢেঁকিশালা রান্নাঘর পড়ে' ভূমিসাৎ। মনে পড়্‌লো বাবার কথা। তাঁর কত আদরের বাড়ী। হায়, সেই বাবাও না খেয়ে মারা গেছে। তাকে এক মুঠো খেতে সে দেয় নি। যার জন্যে দেয় নি, উপার্জ্জনের সব পয়সা যার পায় ঢেলে দিয়েছে, তু'দিন টাকা না পেয়ে সে-ই তাকে অপমান করে বার করে দিয়েছে। আমার কেউ নেই এ জগতে আমার কেউ নেই। ভাঙ্গা দেওয়ালে মাথা রেখে নবীন হাউ হাউ করে' কেঁদে উঠ্‌লো।

অনুশোচনার তীব্রতা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হ'লে নবীন চোখ মুছে শোবার ঘরের দিকে গেল। ভোমরা ষাঁড় সেখানে চোখ বুজে দিব্য আরামে জাবর কাটছিল। এখনও তার যাবার সময় হয় নি, শব্দ পেয়েই চোখ মেলে দেখ্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে মুখ নাড়াও বন্ধ হ'য়ে গেল। তার এই নিভৃত আলয়ে মনুষ্য-সমাগমে যেন একটু বিস্মিত। নবীন দাওয়ায় উঠামাত্র সেও নেমে চলে গেল। টিনের চালের ঘর ঠিক আছে। কেবল বৃহদাকার ষাঁড়টির ওঠা-নামার ফলে মাটির পইটা ভেঙ্গে গেছে। নবীন দেওয়াল হেলান দিয়ে বস্‌লো। ভেতরের তোলপাড় তখনও থামেনি। মানুষ অমানুষ হয় কি করে? মানুষের যা কিছু সব খোয়া গেলে। এতদিনের উপার্জ্জনের সব কিছু সে তাকেই দিয়েছে। অথচ দু'দিন টাকা না পেয়ে সে তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল! একটুও বাধলো না! মায়া মমতা এমন কি, চক্ষুলজ্জার লেশমাত্রও তার নেই। কেন সে এ পথে এসেছে?

ইন্দ্রিয়ের তাড়নায়, না, পেটের জ্বালায়। যে কারণেই হোক্, তিল তিল করে মনুষ্যত্বকে বিক্রী করেই সে সংসার চালিয়েছে। এখন আর তার মধ্যে কিছু নেই। আছে একটা বিরাট পশু। এখন সে ভয়ঙ্করী রাক্ষসী, মানুষের খোলস পরা। কালী তার কাছে আসেনি, ঠিক করেছে। যে রাক্ষসী ভজনা করে, দেবী তার কাছে আস্‌বে কেন? এলে দেবীত্বের অবমাননা হ'ত। উত্তেজনা বশে নবীন উঠে দাঁড়ালো। তারপর পাশের বাড়ী থেকে একটা দা চেয়ে নিয়ে এসে উঠানের জঙ্গল কাট্‌তে বস্‌লো।

পাশের বাড়ীর বিধবা গৃহিণী দাটা নবীনকে দিয়ে কৌতূহল দমন কর্‌তে না পেরে উঁকি দিয়ে দেখে গেল। সংবাদটা কালীর মাকে জানাতেও দেরী কর্‌লো না। কালীর মাও দেখে গিয়ে মনে মনে দেবতার মানত কর্‌লো।

পাঁচকড়ির মাঠ থেকে ফির্‌তে দুপুর উত্তীর্ণ

হ'য়ে গেল। এসেই সে নবীনকে ডাক্‌তে গেল। নবীন তখনও কাজ কর্‌ছিল। উঠান প্রায় ফর্সা করে ফেলেছে। পাঁচকড়িকে দেখেই সে বল্‌লো,

—চলুন।

এল, নাইল, খেল, কিন্তু শুলো না। মাতুর আর একটা বালিশ নিয়ে বাড়ী চলে গেল।

ধূলি আবর্জ্জনায় ভর্ত্তি। কোথায়ও কোথায়ও ইঁতুরে মাটি তুলেছে। তুয়ারে খিল দিয়ে নবীন তার উপরেই মাতুর পেতে শুলো। প্রায় অন্ধকার ঘর। পূর্ব্বদিকের জানালা দিয়ে একটু একটু হাওয়া আস্‌ছিল। জানালার ধারে একটা আম গাছ। পাতাগুলো বাতাসে কাঁপ্‌ছিল। ও আম গাছ তার বাবার হাতের তৈরী। প্রতি বস্তুতে তার হস্তস্পর্শ। নবীন পাশ ফিরে শুলো। বাকি কাজটুকু বিকেলে শেষ কর্‌বে।

রাত্রে খেয়ে উঠে নবীনকে হারিকেন জ্বাল্‌তে দেখে পাঁচকড়ি বল্‌লো,

—এখন কোথায় যাবে ?

—বাড়ী গিয়ে শোব।

—এখন আর ওখানে যায় না।

"না না না, রাত্রে ওখানে শুয়ো না। বনের মধ্যে, কত কালের পোড়ো বাড়ী, সাপ খোপ," বলে কালীর মা সুমুখে এসে উচ্চকণ্ঠে আপত্তি কর্‌লো।

নবীন হারিকেনটা হাতে নিয়ে হাসিমুখে চল্‌তে চল্‌তে বল্‌লো, আমার কিছু হবে না, আপনাদের ভয় নেই।

কথা শুন্‌লো না, চলে গেল। কালীর মা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো, ক্রমে আলো মুচিরামদের বাড়ীর আড়ালে চলে গেলে বল্‌লো, সেই বনের মধ্যে গিয়ে শোবে? চারিদিকে গর্ত্ত গেঁড়ে। তার গা শিউরে উঠ্‌লো। যেমন মেয়ে তেমনি জামাই। তা' না হ'লে মিল্‌বে কেন? জগতের নিয়মই এই।

স্ত্রীকে বিজ্ঞের ন্যায় কথা বল্‌তে শুনে গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ পাঁচকড়ি উচ্চহাস্য করে উঠ্‌লো।

—এতদিন তুমি কি মনে কর্‌তে, জামাই খুব ভাল লোক?

হঠাৎ কালীর মার ভেতরে যেন বিদ্যুৎ ঝল্‌সে গেল। নবীনের কীর্ত্তি-কাহিনী হঠাৎ জেগে মনটাকে তার পুড়িয়ে দিল। রুক্ষস্বরে বল্‌লো, তুমি হেসো না ও রকম করে', গা জ্বালা করে দেখ্‌লে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে কালীর মা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুক্‌লো। পরদিন ভোরে সে সব কাজ ফেলে লেগে গেল জামাইয়ের ঘর পরিষ্কার কর্‌তে।

৯

মাসীর বাড়ী পালিয়ে গিয়ে কালী বাপ-মার তিরস্কার লাঞ্ছনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেও গ্রামের লোকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল না। কি রে, পৃথক্ হ'লি নাকি, বর থাক্‌লো ও পাড়ায়, ইত্যাদি নানা জনে নানা কথা অবিরত তার কাণে বর্ষণ কর্‌তে লাগ্‌লো। কেউ সহানুভূতি জানায়, কেউ নিন্দা করে। সে উত্তর করে না, মনে মনে জ্বল্‌তে থাকে। তার মুখখানা হ'য়ে উঠ্‌লো অস্বাভাবিক গম্ভীর, চোখের দৃষ্টি তীব্রতর। বালিকা-সুলভ চাঞ্চল্য যেটুকু অবশিষ্ট ছিল এই ক'দিনেই নিঃশেষে ঝরে গেল। বয়স গেল বেড়ে। কেউ তার সুখ্যাতি কর্‌লেও সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। মনে করে ঠাট্টা করছে। ফলে, তার মা-বাপ যতই তাকে কাছে আন্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লো, ততই সে গেল দূরে সরে'। একটা উপলক্ষ্য এসে দেখা দিল। বিবাহের নিমন্ত্রণ উপস্থিত। মামাতো ভাইয়ের

বিয়ে। নবীন যেতে রাজী হলো না। কাজেই পাঁচকড়ি ও তার স্ত্রীরও যাওয়া হলো না। কালী বল্‌লো, যাবো। বাবা মা বারণ কর্‌লো। মামা বল্‌লো,

—বেশ, তোমরা কেউ যাবে না, মেয়েকেও যেতে দেবে না। তার ওপর আর কথা নেই। কালী মামীর সঙ্গে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, মাস তিনেক মামার বাড়ী থাক্‌বে।

কালীর মা শঙ্কিত হয়ে উঠ্‌লো। জামাই এতদিন কিছু বলেনি, কিন্তু এবার যদি রাগ করে। রাগে দুঃখে কালীর মা হাত-মুখ কামড়াতে লাগ্‌লো। কিন্তু জামাই কিছুই মনে কর্‌লো না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মাজা ঘসা ঘরের দাওয়ায় মাদুর পেতে বসেছিল, সংবাদটা কাণে এসে পৌঁছ্‌লে বল্‌লো, যাক্ সে। একটুও রাগ বা দুঃখ হলো না। বন-জঙ্গল যেখানে যা ছিল এই ক'দিনেই কেটে ফর্সা করেছে। আম কাঁঠালের গাছ ক'টা একজনকে জমা দিয়েছে পাঁচ টাকায়। সে নগদ টাকা গুণে

নিয়েছে। তিন টাকা রেখে দেবে। দু' টাকা খরচ করে তেল নুণ চাল ডাল কিন্‌বে। এখন থেকে রেঁধে খাবে। পার্‌বে না? দুটো চাল সিদ্ধ করা বৈ ত নয়। খুব পার্‌বে, এই চিন্তা মনের মধ্যে নিয়ে যখন সে তোলাপাড়া কর্‌ছে সেই সময় তারও চিঠি এসে পড়্‌লো। ধর্ম্মঘট মিটে গেছে। কুলিরা না খেতে পেয়ে কাছে যোগ দিয়েছে। কর্তৃপক্ষ মজুরি বাড়ায়নি। তবে ধর্ম্মঘটকালীন বেতন পুরো দিয়ে দেবে। যে দিন যে কাজে যোগ দেবে সেই দিনই।

খবর শুনে ভয়ে কালীর মার অন্তর কেঁপে উঠ্‌লো। অভাবের সংসারে নূতন পোষ্য আসায় কষ্ট তার কম হচ্ছিল না। কোনদিন আধপেট খেয়ে, কোন দিন না খেয়ে দিন কাটাচ্ছিল। তবু হঠাৎ কলকাতার নামে তার মন উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে উঠ্‌লো। জামাই সেখানে কাজ করে। আজ না হয় কাল তাকে যেতেই হবে, জানা কথা। তবু সে স্থির থাক্‌তে পার্‌লো না। মন যেন আয়ত্তের

বাইরে। পোড়ারমুখী যদি ও রকম না হতো। এর পরে জামাই যদি আরও খারাপ হয়, যদি একেবারেই বাড়ী না আসে, তাকে ত দোষ দিতে পারিনে। সুরেনের মেয়ে ছিল ঐ রকম। জামাই এলে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াতো। একবার শ্বশুর নিয়ে গিয়েছিল জোর করে। ঘর কর্‌লো না, পালিয়ে এলো। ফলে, জামাই এত ভাল ছেলে, হ'য়ে গেল বদমায়েস। দোষ কার? জামাইয়ের, না, মেয়ের? ইচ্ছে কর্‌তে লাগ্‌লো, এখনই বাপের বাড়ী গিয়ে তার চুলের মুঠো ধরে নিয়ে আসে।

নবীনকে বল্‌লো, ঘর দুয়োর পরিষ্কার কর্‌লে, বাস না কর্‌লে আবার ত জঙ্গল হ'য়ে যাবে।

—বাসই ত কর্‌ব মা, নইলে পরিষ্কার কর্‌লাম কেন? প্রত্যেক হপ্তায় বাড়ী আস্‌বো। শনিবার বিকেলে এসে সোমবার সকালে যাবো।

—কালীর মা মনে মনে আবার দেবতার মানত কর্‌লো।

—আপনি যদি পারেন সন্ধ্যেটা দেবেন।

ভোরে উঠে শ্বাশুড়ী রেঁধে দিল। নবীন খেয়ে-দেয়ে পান চিবাতে চিবাতে গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লো। মন বেশ খুসী। আজ টাকা পাবে। সত্য মিস্ত্রী কত বারণ করেছিল। তখন তার কথা শুনলে আজ এ অবস্থা তার হ'ত না। এত পয়সা উপায় করেও আজ সে পথের ভিখারী। এ পাড়া ছেড়ে এবার তার কাছে গিয়েই বাসা নেবে। তবে আজ একটু সে খাবেই। মনটা ছোঁ ছোঁ কর্‌ছে। কত দিন খেতে পায়নি। কি হয় মদ খেলে? সত্য মিস্ত্রী ত খায়। কিন্তু সে ত বদমায়েস নয়। বেশ সংসার কর্‌ছে। পয়সাও জমিয়েছে।

সন্ধ্যেবেলা ছুটির পর গেটের বাইরে আসামাত্র ঘোর কৃষ্ণবর্ণা একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তার গেঞ্জি টেনে ধরে' বল্‌লো,

—চলো, যেতে বলেছে।

তার মুখের দিকে চেয়ে নবীন থম্‌কে দাঁড়ালো। মাথার লম্বা পাকা চুল মুখের উপর এসে

৬

পড়েছে। চোখ হুটো সাদা। দাঁতগুলো উঁচু উঁচু। যে আসে সেই তার বিকটদর্শন মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

—চল চল, দাঁড়ালে কেন ?

—না, যাবো না।

—যাবে না কি, যেতে বলেছে যে !

—কেন, টাকা পেয়েছি বলে' ? নবীনের গা শিউরে উঠ্‌লো। ট্যাঁকের টাকাগুলোয় একবার হাত দিয়ে সে চল্‌তে আরম্ভ কর্‌লো।

মাগী ছুটে গিয়ে তার কাপড় টেনে ধর্‌লো। ব্যাপার দেখে যারা দাঁড়িয়েছিল হেসে উঠ্‌লো। লজ্জিত বিরক্ত নবীন সজোরে তাকে এক লাথি মেরে ছুট্‌তে ছুট্‌তে স্টেসনে চলে' গেল।

নবীন গাড়ীতে চড়ে বস্‌লো। মদ খাওয়া আর হল' না।

কথাটা কালীর মা কাণে তুল্‌লো না

—তুমি ঠাট্টা কর্‌ছো দিদি, জামাই বলে' গেছে শনিবারের দিন বিকেলে আস্‌বে।

—বিশ্বাস না হয়, দেখ্‌বি আয়, রান্না চড়িয়েছে।

হারুর মা তার হাত ধরে' টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে গেল।

সত্যিই ত, সে ভাত রাঁধ্‌ছে। আনন্দের আতিশয্যে কিছুক্ষণ কালীর মার মুখ দিয়ে কথা বার হলো না। উনুন নেই। খানকয়েক ইট উনুনের আকারে সাজিয়ে হাঁড়ি চড়িয়েছে। চাল ডাল তরকারি এখনও ঘরের মেঝেয় ছড়ানো।

—রাঁধ্‌তে গেলে কেন এত খেটে খুটে এসে?

নবীন হাস্‌লো, কোন জবাব দিল না।

পাঁচকড়ি মাঠ থেকে ফির্‌লো, তখন এক ঘণ্টা রাত। নবীনের সংবাদটা দিয়ে কালীর মা বল্‌লো,

—ছুঁড়িটাকে কালই গিয়ে নিয়ে এসো। জামাই রেঁধে খাবে আর সে ঐ রকম করে' বেড়াবে নাকি?

—আন্‌তে গেলেই কি সে আস্‌বে?

—জোর করে নিয়ে এসো।

—আর নিয়ে এলেই কি সে জামাইয়ের ভাত রেঁধে দিতে যাবে ?

—যায় কি না যায় আমি দেখে নেব।

—ফলে কিছুই হবে না, কেবল কেলেঙ্কারিটা দশখানা গাঁয়ে ছড়াবে।

—ছড়াক্, সুরোর মেয়ের কি হ'ল দেখেছ ত ?

—তাতে আর কালীতে অনেক তফাৎ।

—কেন ?

—আট বছর বয়েসে বিয়ে হ'ল, সে ভয়েই ও রকম কর্‌তো। এ ত আর সে জন্যে নয়, অন্য কারণে।

—তা' হ'লে আমরা চুপ করে' থাক্‌বো ?

—দেখ না আর দিন কতক, জামাই যদি ভালভাবে থাকে আপনিই সব মিটে যাবে।

১০

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় কেটে গেল। শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি শিবি আবার এলো বাপের বাড়ী। ছেলে হবে। সেখানে পাকা গৃহিণী কেউ নেই, তাই তার মা দু'মাস আগেই নিয়ে এলো। কিন্তু এবার সে আর বার হয় না। কালী নেই। তা' ছাড়া তার মা কোথায়ও যেতেও দেয় না। সেদিন বিকেলে কালীর মা কি একটা দরকারে শিবিদের বাড়ী গিয়ে একটা দৃশ্য চোখে পড়্‌তেই পিছিয়ে এলো। সে জান্‌তো না দুপুর বেলায় তাদের জামাই এসেছে। বেটা ছেলেরা কেউ বাড়ী নেই। শিবির মাও পাড়ায় কোথায় গেছে। শিবিকেই ডাক্‌বে মনে করেছে এমন সময় হাসির শব্দ কাণে যেতে দেখ্‌লো, দখিণ-দুয়ারী ঘরের দাওয়ার বস্তাগুলোর পাশে সে রয়েছে। কি একটা জিনিষ জামাই যতই জোর করে শিবির

মুখে গুঁজে দেবার চেষ্টা কর্‌ছে সে তত জোরে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে,আর খিল খিল করে হাস্‌ছে। দেখেই অলক্ষ্যে অতি সন্তর্পণে সে বাড়ী ফিরে এলো। মনে পড়্‌লো তার নিজের মেয়ে জামাইয়ের কথা, আর প্রাণের ভেতরটা তার হুহু করে' উঠ্‌লো। নিজের শত অভাব সত্ত্বেও পরের ভাল দেখে কখনও কালীর মার হিংসা হ'ত না। কিন্তু আজ সে বদ্‌লে গেছে। কারও সুখের কথা শুন্‌লেই তা'র দুঃখী প্রাণ জ্বলে উঠে। কেউ আপন ছেলেমেয়েকে ভাল বল্‌লে সে মনে করে তার মন্দ, তাই তাকে শুনাচ্ছে।

—চুপ করে' কেন বসে আছ মা, এখন তোমার কোন কাজ নেই?

মাটির খুরি, নারিকেলের মালা প্রভৃতি খেলার জিনিষগুলি যথাস্থানে গুছিয়ে রেখে হাবু মায়ের কাছে এসে দাঁড়ালো।

—না বাবা, এখন কোন কাজ নেই।

—নেই বৈ কি, তোমার আবার কাজ নেই!

—চল্, তোর দাদাদের বাড়ী থেকে বেড়িয়ে আসি।

—চল, সেই লাঠিটা আমি নিয়ে আস্‌বো।

—কোন্ লাঠিটা ?

—তুমি জানো না বুঝি, দাদার কি সুন্দর একটা লাঠি আছে, ঘরের চালে ঝুলিয়ে রেখেছে।

হাবুকে নিয়ে কালীর মা নবীনদের বাড়ী গেল। ঘরে তালা দেওয়া। তখনও নবীন বাড়ী আসেনি। দাওয়ার উপর চুপ করে' কিছুক্ষণ বসে থাক্‌লো।

—ঐ দেখ্ মা লাঠি।

কালীর মা দেখ্‌লো, সত্যিই এক গাছি নতুন বেতের ছড়ি চালের বাখারিতে ঝুলানো।

—আমি নেই ?

—না, তোমার দাদা মার্‌বে।

—তবে দাদার কাছে চেয়ে নেব ?

কালীর মা কোন উত্তর দিল না, বল্‌লো, চল বাড়ী যাই। রাস্তায় এসে তার মনে হ'তে লাগ্‌লো

জামাই তার ভাল, খুব ভাল। নষ্টের গোড়া সেই ছুঁড়িটা। এখন যদি তাকে পেতো এখানে।

যাই হোক্, এখন পর্য্যন্ত নবীনের সংকল্পের কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। সকালে যায়, বিকালে আসে। দু'বেলার চাল নিয়ে ভাত রাঁধে। অর্দ্ধেক খায়, অর্দ্ধেক রেখে দেয় জল দিয়ে। সকালে ভিজে পান্তা খেয়ে বার হয় কাজে। দীর্ঘ বর্ষা কেটে গেল মাথার ওপর দিয়ে। ভিজে ভাত খেয়ে, জল কাদায়, ঠাণ্ডা হাওয়ায় যাতায়াত করে' শরীর খারাপ হ'য়ে গেল। সর্দ্দি কাসি দেখা দিল। তবু সে প্রতিনিবৃত্ত হ'ল না। অত লোকের সাম্‌নে মাগীর সেই আচরণ, বন্ধুদের বিদ্রূপের হাসি মনে পড়্‌লেই তার ভেতরটা কেমন করে উঠে।

এদিকে মাস যত শেষ হ'য়ে আস্‌তে লাগ্‌লো বর্ষাও তত বাড়্‌লো। নদীর জলও তত পাড় বয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো উঁচু হ'য়ে। মাঠ ভরা ধান। যত

দূর দেখা যায় কেবলই ধানের গাছ। দেখে চাষীর বুক দশ হাত ফুলে উঠে। সজল কালো মেঘ দিগন্তে নেমে যায় ধানের ক্ষেতে। নদীর জল বৃদ্ধির কথা মনে হলেই চাষীর মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে যায়। উপরি উপরি দুটো বছর কিছু পায়নি। এমনি মাঠ-ভরা ধান ডুবে গেছে। ঘরে আগুন লাগ্‌লে ক্ষতি এর চেয়ে বেশী হয়! কি করে যে সে আঘাত সহ্য করেছে, ছেলে মেয়ে সংসার নিয়ে একদিন একদিন ক'রে কি করে' যে দুটো বছর কাটিয়েছে, অনুভব কর্‌বার শক্তি কারুর নেই। মাস দুই আগে জলের অভাবে দুঃখের অবধি ছিল না। আর আজ বন্যায় সব যেতে বসেছে। নিজেদের অস্তিত্ব তাদের নিজেদের ওপর নয়, প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভর করে। এবারও যদি সেই প্রকোপে পড়ে, বন্যার স্রোতে ধান পাট ভেসে যাওয়ার সঙ্গে তারাও ভেসে যাবে। দাঁড়াবার স্থান থাকবে না। উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাই একবার ক্ষেতের দিকে তাকায়, দেখে ধান পাক্‌তে আর কত

দেরী। একবার ক্রোশ খানেক হেঁটে নদীতে গিয়ে দেখে আসে ক' আঙ্গুল জল বাড়্লো। ভেবে ভেবে হিসেব করে বলে, যদি দিন পনর মধ্যে নদী ছাপিয়ে না যায়, যদি আর পনরটা দিন থাকে, ধান অনেক পাওয়া যাবে। কিন্তু যে বেগে জল বাড়্ছে, থাক্বে কি! তায় আবার সুমুখে অমাবস্যা।

ঠিক পরের দিনই সন্ধ্যেবেলা ক্ষুদিরাম এসে জানালো, বুনো গাড়ীর মুখে ও তিলকে তলায় নদীর জল চল্কে চল্কে পাড়ের ওপর পড়্ছে। একটু একটু গড়িয়েও আস্ছে। সংবাদটা এক মুহূর্ত্তে গ্রামময় ছড়িয়ে পড়্লো। সবাই বিপদের কথা জান্তো। কিন্তু সে যে এত আসন্ন তা' কেউ মনে করেনি। সুতরাং এ জন্যে প্রস্তুতও ছিল না। আকস্মিক দুঃসংবাদে গ্রামের নরনারী একেবারে মূক হ'য়ে গেল। তা' হ'লে এবারও ধান পাওয়া যাবে না। সমস্ত রাত্রি ধরে, সব গ্রামের লোক মিলে দু' জায়গায় বাঁধ দিয়ে এলো। পরদিন

খবর পেল, জল পাড় ছাপিয়ে বাঁধের গোড়ায় আধ হাত উঁচু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। মাঠ এখনো কালো। কদাচিৎ এক আধটা ক্ষেতে সোণালী রঙের আভা দেখা যায়। কিন্তু শীষের অর্দ্ধেক ধানে এখনও চাল ভর করেনি। কোন কাজ এখন হাতে নেই। অথচ সুমুখে কাজের পাহাড়। কর্‌বার উপায় নেই, হাত গুটিয়ে বসে আছে। অবস্থা দেখে প্রলয়ের দেবতা অট্টহাসি হাস্‌ছে। মুখের অন্ন কেড়ে নিতে এত উল্লাস!

দারুণ উদ্বেগ ও প্রতীক্ষার ভেতর দিয়ে কোন রকমে ছ' সাতটা দিন কেটে গেল। মাঠের অর্দ্ধেক ধান উঠ্‌লো পেকে। নদীর জলও ক্রূর হেসে নেচে নেচে পাড়ের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো। ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে নদী দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। যতদূর দেখা যায় কোথায়ও পাড় উঁচু নেই। জল স্থলে সমতল। বাঁধ ছুটিরও কানায় কানায় জল। কখন ভেঙে পড়ে কে জানে। আর কি দেরী করা চলে! যা পেকেছে

সেই ভাল। লেগে গেল সকলে ধান কাট্‌তে। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর রাত্রেও বিরাম দিল না। মেঘলা আকাশ। আব্‌ছায়া মিট্‌মিটে জ্যোৎস্না। সেই আলোতেই তারা পূর্ণোদ্যমে কাজ কর্‌তে লাগ্‌লো। লোকজন, গরুমহিষ, বোঝাই গাড়ীর যাতায়াতে রাস্তার কাদা এক হাঁটু হ'য়ে উঠ্‌লো। দু'দিনের মধ্যে মাঠও হ'য়ে গেল প্রায় অর্দ্ধেক ফর্সা। আর দু'দিনেই শেষ হ'য়ে যাবে। কোন রকমে বাড়ী নিয়ে গিয়ে তুল্‌তে পার্‌লে অবসরমত মেড়ে চট্‌কে নেবে।

পাঁচকড়ির এখন অর্দ্ধেক ধান মাঠে, অর্দ্ধেক এসেছে বাড়ী। কালীর মা অবশ্য মেয়ে জামাইয়ের ভাবনা ভুলে গিয়ে এখন উঠানের ধান গুছাতে লেগে গেছে। এক ঘণ্টা রাত থাক্‌তে পাঁচকড়ি মাঠে গিয়েছিল, যখন ফিরে এলো তখন বেলা প্রায় চারটে। দুটো খেয়েই আবার যাবে। তাড়াতাড়ি নেয়ে খেতে বস্‌লো। অমনি পাশের বাড়ীর উঠান থেকে ক্ষুদিরাম চীৎকার করে' উঠ্‌লো,

—ঐ সব গেল, সব ডুবে গেল।

—সব ডুবে গেল কিরে ?

খেতে খেতেই পাঁচকড়ি মাঠের দিকে উঁকি দিয়ে দেখ্‌লো, সুমুখের খাল দিয়ে তীব্র জলের স্রোত তীরবেগে ছুটে চলেছে।

সত্যিই ত! বাঁধ ভেঙে গেল, না, কেউ কেটে দিল!

কালীর মা দেখেই কাঁদো কাঁদো হ'য়ে বল্‌লো,

—ওগো আমাদের কি হ'বে ?

—কি আবার হবে, ধান ত আমাদের একলার ডুব্‌লো না, অনেকেরই ডুব্‌লো, তাদেরও যা হ'বে আমাদেরও তাই হ'বে। স্ত্রীকে এতটা বিচলিত ভয়বিহ্বলা হ'তে দেখে পাঁচকড়ি একটু শক্ত হ'য়ে জবাব দিল।

একটু পরে খবর এলো জেলেরা বাঁধ কেটে দিয়েছে।

এ অপেক্ষা মর্ম্মান্তিক ক্ষতি আর কি কর্‌তে

পারে মানুষে। আর দুটো দিন সবুর কর্‌লে মাছ জল থেকে কি পালিয়ে যেত!

যে দু' একজনের সব ধান বাড়ী এসে গেছে তারা বল্‌লো, শালাদের নামে এক নম্বর রুজু করে দেওয়া যাক্। যাদের সব আসেনি তারা ছুট্‌লো মাঠে। অতি ক্রোধে যে সব গালি অনেকের মুখ দিয়ে বার হ'ল সেগুলি তাদের মানসিক অবস্থা প্রকাশে সাহায্য কর্‌লেও কাগজের পাতায় দেওয়া চলে না।

পাঁচকড়ি বল্‌লো, যা' কাট্‌তে বাকি আছে সে ত গেলই, তবে মাঠে যা' কাটা পড়ে' আছে এখনই গিয়ে না নিয়ে এলে সে ভেসে চলে যাবে। কিন্তু আনিই বা কি করে' একলা। গাড়ী বোঝাই করা, দড়া বাঁধা একলা ত হবে না।

নবীন বল্‌লো, চলুন, আমি যাই।

ক'দিন ধরেই নবীন মনে কর্‌ছিল ছুটি নিয়ে শ্বশুরের কাজে সাহায্য কর্‌বে। কিন্তু নিই নিই করে নেওয়া হয়নি। আর শরীরও তত ভাল ছিল না। সর্দ্দি কাশি এখনও আছে। কিন্তু আজ

"চলুন যাই" কথাটা মুখ দিয়ে বার হওয়া মাত্র মনে খুব আনন্দ হ'ল। গামছাটা মাথায় জড়িয়ে গাড়ীতে চড়ে বস্‌লো।

বৃষ্টি পড়্‌ছিল ফিস্‌ ফিস্‌ করে। বাঁধ ভাঙা জলের তীব্র স্রোত ছুটে চলেছিল সুদূর কলাইঘাটার দিকে। বিলটা ভর্ত্তি হ'তে যেটুকু দেরী। দু'ঘণ্টার মধ্যে মাঠ ডুবে যাবে।

গাড়ী বোঝাই কর্‌তে কর্‌তে পাঁচকড়ি অদূরবর্ত্তী ধানের ক্ষেতটির দিকে বার বার তাকাচ্ছিল। এক হাত লম্বা লম্বা শীষ ধানের ভারে নত হ'য়ে বৃষ্টির জল মাথায় নিচ্ছে। বন্যার জল গোড়ায় এসে লেগেছে। এখনই ডুবে যাবে। একটু পরে আর দেখা যাবে না। বিপদটা আর নূতন না থাক্‌লেও নতুন করে' আর একটা দীর্ঘশ্বাস তার অন্তঃস্থল থেকে ঠেলে বার হ'য়ে গেল।

বোঝাই শেষ করে', দড়া কসে', যখন গরু জুড়ে দিল তখন মাঠ প্রায় ডুবে গেছে। ক্বচিৎ কোন উঁচু জমির একটু অংশ কিম্বা কোন আলের মাথার

বেনা গাছের আগাটা জেগে আছে। আর সব শাদা। এখান থেকে ওই গ্রামের কোল পর্য্যন্ত কেবল জল। গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের কলরব জলের উপর দিয়ে ভেসে আস্‌ছে। এত পয়সা ও পরিশ্রমের এরূপ অপচয় আর কাদের হয়!

রাস্তা চিন্‌বার উপায় ছিল না। পাঁচকড়ি সোজা মাঠে মাঠে গাড়ী চালিয়ে দিল। এক একটা ডোবা ধানের ক্ষেতে গাড়ী এসে পৌঁছায়, পরের ধান, তবু মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠে। গরু ছুটো ধান খেতে জলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে দেয়, কাঁধ থেকে যোয়াল খসে পড়্‌বার উপক্রম হয়, আর পাঁচকড়ি সজোরে তাদের পিঠের উপর বসিয়ে দেয় পাঁচনের বাড়ি। শীষ টেনে তুলে নিয়ে তারাও চিবাতে চিবাতে ছুট্‌তে থাকে।

খালের কাছে এসে পাঁচকড়ি গাড়ী দাঁড় করালো। বল্‌লো, গরু ছুটো একটু জিরিয়ে নিক্। যাবার সময় খালের জল গরুর তলপেট স্পর্শ

করেছিল। এখন অন্ততঃ বিশ হাত সাঁত্‌রে গাড়ী পার করাতে হ'বে।

খালে নাম্‌বামাত্র গরু সাঁতারে পড়্‌লো। গাড়ী ভেসে উঠ্‌তে খিল খুলে গিয়ে বাঁ দিকের চাকাটাও খুলে ভেসে চল্‌লো। "ঐ যা" বলে নবীন খপ্‌ করে চাকাটা ধরে পরিয়ে দিতে গিয়ে নিজেই ডুবে গেল। পাঁচকড়ি তৎক্ষণাৎ চাকাটা পরিয়ে দিল। কিন্তু নবীন কই? সে ডুবে গেল কেন? মুহূর্ত্তে পাঁচকড়ি চারিদিক অন্ধকার দেখ্‌লো। গাড়ী পরক্ষণেই যেই জলে এসে দাঁড়ালো, পাঁচকড়ি উন্মাদের মত আথাড়ি পাথাড়ি খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে দেখ্‌লো নবীন তার সুমুখে এক হাত দূরে ভেসে উঠ্‌লো। হাত ধরে টেনে অল্প জলে নিয়ে এসে গামছা দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দিলে সে বল্‌লো, কিছু হয়নি, ছেড়ে দেন, আমি যেতে পার্‌বো।

১১

বিয়ের কাজ মিটে গেল। জ্ঞাতি কুটুম্ব যারা এসেছিল একে একে সবাই চলে গেল। কালীর মাসীও চলে গেল। থাক্‌লো কেবল কালী। মাসী অনেক করে' বল্‌লো, সে কোন কথা বল্‌লো না। খানিক দূর এগিয়ে দিয়ে এসে সে হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচ্‌লো। এখানে এসে তার সব চেয়ে বড় শান্তি এই যে, সারা গ্রামের লোকের কৌতুক-দৃষ্টির সামনে তাকে ঘুরে বেড়াতে হয় না। আগে দুর্ভোগ কি কম ছিল? ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ যার সঙ্গে দেখা হয়েছে তারই মুখে লক্ষ্য করেছে ভাবান্তর। এ সব তার গায় ছুঁচের মত ফুটেছে। তার বাপ-মা, মেসো-মাসীর মুখের দিকে ত সে বহুদিন তাকায় নি। আর নবীনের দিকে! মাসীর বাড়ী পালিয়ে আসার পরের দিন হঠাৎ পথের মাঝে তার সঙ্গে দেখা। এই পাড়ার দিকেই সে আস্‌ছিল। সরু পথ। দু'ধারে বেড়া

আঁটা। কোথায় যে দাঁড়াবে তার ঠিক ছিল না। সেদিন তার ইচ্ছে কর্ছিল লাথি মেরে বেড়া হুটোকে ভেঙে ফেলে দেয়। এখানে এসেছে, না, সে বেঁচেছে। দাওয়ায় খুঁটি হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে মামীর কাছে গিয়ে বল্লো,

—কি কর্বো বল, চুপ করে বসে থাক্তে ভাল লাগে না।

—কি আর কর্বি এখন, যা হুটো শাক তুলে নিয়ে আয়গে।

পূর্ব্ব পশ্চিম লম্বা গ্রামটার সুমুখ দিয়ে একটা বিল বরাবর পূর্ব্ব দিকে চলে গেছে। কিন্তু এখন সেখানে হাঁস চরে না, পানকৌড়িও ডোবে না। এক হাঁটু জল গরুর পায়ে পায়ে ঘোলা হ'য়ে আছে। তারই হু'ধারে এক হাঁটু শুশুনি শাক। কালী হুপুর পর্য্যন্ত বসে বসে এক ঝুড়ি শাক তুলে নিয়ে এলো।

তারপর থেকে কালী যখন তখন শাক তুল্বার

নাম ক'রে বিলের ধারে এসে বসে থাকে। জায়গাটা তার বেশ ভাল লাগ্‌লো। এখানে ওখানে একটু আধটু পানা, দু'ধারে কালো দুর্ব্বাঘাস ও শুশুনি শাক। আকারে প্রকারে ঠিক বিলের মত। বিলের যা কিছু সব আছে। নেই কেবল জল। কোন একটা কারণে যেন এর প্রাণবস্তুটি শুকিয়ে যাচ্ছে। তার নিজের জীবনের সঙ্গে এর কোথায়ও কি মিল আছে। না নেই, একেবারেই নেই। কেন কি হয়েছে তার! সে ভালবাসে এর প্রশান্তিকে, এর নির্জ্জনতাকে। তাই নষ্টবুদ্ধি খল মানুষের সাহচর্য্য, তাদের কোলাহল এড়িয়ে তার এখানে এসে বসে থাক্‌তে ভাল লাগে। সরু বিল গ্রামের ধারে ধারে দৃষ্টি পথের বাইরে চলে গেছে, কালী সেই দিকে চেয়ে থাকে। কখনও বেলার দিকেও তাকায় না। মামা মামী ডাকে, ওরে আয়, আর তুল্‌তে হ'বে না, সে তাড়াতাড়ি দু'মুঠো ছিঁড়ে নিয়ে চলে যায়।

-যা দেখি, ওদের কুয়ো থেকে একটু জল নিয়ে আয়, মামী বল্‌লো।

কালী কলসী নিয়ে পাশের বাড়ী গিয়ে দেখ্‌লো, কুয়োর পাড়ে দড়ি নেই। এদিক ওদিক তাকিয়ে কোথায়ও দেখ্‌তেও পেল না। একটি মেয়ে ঘর নিকাচ্ছিল, তার দিকে চাইল কিন্তু কিছু বল্‌লো না। সে কি কর্‌বে ভাব্‌ছে, এমন সময় দাওয়ায় উপবিষ্ট একটি যুবক ঘরের মধ্যে থেকে দড়িটা নিয়ে এসে দিল। কিন্তু দেবার সময় মেয়েটি যে ভাবে তার দিকে তাকালো, তাতে বোঝা গেল সে মোটেই সন্তুষ্ট হয়নি। জল নিয়ে তাদের বাড়ীর বার হ'তে না হ'তে শুন্‌তে পেল,—আনাড় জায়গায় তুলে রেখেছি, সেখান থেকে বার করে দিলি! কেন, এত কেন? লোক জল নিতে আস্‌বে, তা দড়ি নিয়ে আস্‌বে না। ঐ রকম করে সে দড়িটা এক মাসের বেশী গেল না।

কালীর ধারণা ছিল জলের জন্যে কেবল তাদের গ্রামের লোকই মুখ নাড়া দেয়। এ যে

কোন গ্রামই বাদ যায় না! সংসারের সমস্ত কাজ লোক ঐ বিলের কাদা জলেই করে। কেবল রান্না ও একটু খাবার জলের জন্যে যায় পরের বাড়ী। তাও তারা হাসিমুখে দিতে পারে না। বাড়ী গিয়ে কলসীটা রেখেই কালী মামীকে বল্‌লো—তোমরা কি একগাছা দড়াও কর্‌তে পারো না? মামী তার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লো,—পার্‌বো না কেন, দড়া কি আমাদের ছিল না? কাজের সময় কে কাদের বাড়ী জল তুল্‌তে গিয়ে ফেলে এলো, আর পাওয়া গেল! বার কর্‌লো আর কেউ ঘর থেকে। নেক, নিয়ে মরুক্‌, গলায় দিয়ে মরুক্।

—পার যখন, একটা কুয়ো কেটে ফেল্‌লেই হয়, আর কারও মুখনাড়া খেতে হয় না।

—কাট্‌লেই কি পাড়ার লোক রাখ্‌বে নাকি, রাগ করে সেবার তোর সুধে মামা কাটেনি? ঘড়া নামিয়ে নামিয়ে পাড়গুলো ভেঙে চুরমার করে দিল, যেমন বর্ষা এলো হুড়মুড় করে পড়ে গেল।

পাড়ার পাঁচজন অপেক্ষা মামী যে কম নয়, বরং একটু বেশী, কালী বুঝ্‌তে পেরে চুপ করে গেল। সে কাজের সময় কাজ করে, বাকি সময়, হয় বিলের ধারে, না হয়, বাড়ীতেই চুপটি করে বসে থাকে। পাড়ার দিকে একেবারেই যায় না, পাছে কেউ তার সব খবর জিজ্ঞাসা করে, পাছে সব জানাজানি হয়ে যায়। জল আন্‌তেও চায় না। সাবধানে বেছে বেছে এমন সব কাজ নেয় যাতে ও কাজে তার ডাক না পড়ে। কিন্তু সেদিন ছুপুর বেলা মামা খেতে বসেছে। মামী হেঁসেলে। সেখান থেকেই ডেকে মামী বল্‌লো,—একটুও জল নেই, তোর মামা খেয়ে উঠে আঁচাতে পাবে না, শীগ্‌গির এক কলসী জল নিয়ে আয়।

কি করবে। কালী কলসীটা নিয়ে ভাব্‌তে ভাব্‌তে গেল। দড়া যদি সেখানে না থাকে! চাইলে কি দেবে! সেই ছোঁড়াটার কথা মনে পড়্‌লো। আজও যদি সে দাওয়ায় বসে থাকে—

থাক্‌লেও সে আজ নাও দিতে পারে। সেদিন বকুনি খেয়েছে।

গিয়ে দেখ্‌লো, দড়ি নেই, তবে ছোঁড়াটা দাওয়ায় বসে আছে। কালীকে দেখেই এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে সে ঘরের ভিতর থেকে দড়িগাছটি এনে দিল। জল তোলা হয়ে গেলেই আবার নিয়ে গিয়ে রেখে দিল।

ছোক্‌রার মনটা ভাল। কালী হৃষ্টচিত্তে কলসী কাঁখে বাড়ী এলো।

পরদিন বেলা আটটা কি ন'টা হবে। উঠ্‌তি রোদে চারিদিক ভরপুর। লোকজন সব মাঠে ঘাটে চলে গেছে। বিলের ধারটা নির্জ্জন। কালী একটা গামছা মাথায় দিয়ে শাক তুল্‌তে গেল। রৌদ্রদীপ্ত জলের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সে কাজে লেগে গেল। মুঠো মুঠো পাতা টেনে টেনে ছিঁড়বার সময় এক একটা ফড়িং ভেতর থেকে বার হয়ে তার গায়ে উড়ে উড়ে পড়তে লাগ্‌লো। এক এক ঝাঁক চড়াই পাখী এসে বসে, ঠোকাঠুকি, উল্‌টি

পাল্‌টি, কিস্‌মিস্‌ করে ; আবার উড়ে যায়। কালী হাতের কাজ বন্ধ রেখে সেই দিকে চেয়ে থাকে। তাদের বড় স্ফুর্ত্তি। একটু দূরে সুমুখে প্রায় শ'খানেক প্রজাপতি কাদার উপর বসে পাখা নাড়্‌ছিল। রৌদ্রে তাদের গায়ের বিচিত্র রং আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। কালীর দৃষ্টি গেল হঠাৎ সেই দিকে। অমনি শাক তোলা ফেলে কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে' ছোট্ট একটি ঢিল তাদের মধ্যে ফেলে দিল। সব গুলো উড়ে পাঁচ হাত দূরে গিয়ে বস্‌লো। যেন রঙীন কাগজের টুক্‌রো হাওয়ায় উড়ে আর এক জায়গায় গিয়ে পড়্‌লো। কালী আবার সেইখানেই যাচ্ছিল, পিছনে মানুষের সাড়া পেয়ে থম্‌কে দাঁড়ালো।

প্রজাপতি তাড়িয়ে বেড়াচ্ছ বুঝি !

সেই ছোক্‌রা হাস্‌তে হাস্‌তে কাছে এসে দাঁড়ালো।

কালীও হেসে শাক তুল্‌তে লেগে গেল। কোন জবাব দিল না।

—আমায় দুটো শাক দেবে ?

"নাও" বলেই কালী যে ক'টা শাক তুলেছিল তাকে দিতে গেল।

—কিসে নেব ?

—আঁচলে।

—দূর, ভাল দেখায় না।

—বেশ দেখাবে।

—না না, আঁচলে করে নিয়ে যাবো কি, মেয়ে মানুষ নাকি ?

কালী হেসে ফেল্‌লো, বল্‌লো, তা হোক্‌, নাও। সে আঁচলটা ধরে বেঁধে দিতে গেল। কিন্তু ছোক্‌রা জোর করে আঁচলটা টেনে নিল। আর শাকগুলো মাটিতে পড়ে গেল। কালী শাক কুড়াতে কুড়াতে বল্‌লো,—তুমি নেবে না তাই বল।

—হ্যাঁ নেব, শুশ্‌নি শাক আমার বড্ড ভাল লাগে, বলে সেও দুটো কুড়িয়ে তার আঁচলে তুলে দিল।

—আচ্ছা, আমি তোমাদের বাড়ী দিয়ে আস্‌বো 'খন।

-না না, খবরদার না।

—কেন ?

—মা রাগ কর্‌বে।

—তুমি নিয়ে গেলে রাগ কর্‌বে না, দিয়ে এলেই রাগ কর্‌বে ?

হ্যাঁ, রাগ কর্‌বে।

কালী এতক্ষণে বুঝ্‌তে পার্‌লো সে খেলা কর্‌ছে, বল্‌লো,—যাও, তোমার ঠাট্টা কর্‌তে হবে না।

"রাগ কর্‌লে" বলে ছোক্‌রা তার গালটা টিপে দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে চলে গেল।

কালী অবাক্‌ হয়ে গেল। গায়ে হাত দিয়ে এ আবার কি ধরণের তামাসা !

পরদিন শাক তুল্‌তে নয়, এমনি এসে জলের ধারে দাঁড়াইতেই ছোক্‌রাও এসে উপস্থিত হ'ল। যেন পথ চেয়ে বসেছিল।

ছোক্‌রা এক গাল হেসে বল্‌লো,

—আজ কি মনে করে? জল নিতে নাকি? কিন্তু জল আঁচলে নেওয়া যায় না!

—তুমি কি মনে করে?

—এলাম একটু গল্প করতে।

—মেয়ে মানুষের সঙ্গে কি গল্প?

—তুমি আর জল আনতে যাও না যে?

কালী তার মুখের দিকে একবার চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো—দরকার হয় না, তাই যাইনে।

"অত রেগে যাচ্ছ কেন" বলেই ছোক্‌রা তার গাল টিপে দিল।

কালী তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো,—তুমি কি রকম লোক, গায় হাত দাও কেন ছেলেমানুষের মত?

—ছেলেরা গায় হাত দিলে দোষ হয় না, আর যোয়ানরা হাত দিলে বুঝি দোষ হয়?

বলে' আবার সে হাতখানা তার কাঁধের উপর রাখ্‌লো। কালী সজোরে হাতখানা ঠেলে দিয়ে বললো,—আমি এক্ষুনি গিয়ে বলে' দিচ্ছি।

—না না না না, এই আমি চলে যাচ্ছি।

বলে' ছোক্‌রা শিস্‌ দিতে দিতে চলে গেল।

কালী গিয়ে মামীকে বল্‌লো,—ওদের বাড়ীর ওই ছোঁড়াটা কোন কাজ করে না নাকি ?

—না, ও চাকরী কর্‌বে।

—চাকরী ! ও লেখাপড়া জানে নাকি ?

—মামা না মেসোর বাড়ী কোথায় ছিল। সেখানে নাকি রাত্রে পাঠশালায় পড়েছিল।

—তাতেই চাকরী কর্‌বে ?

—হ্যাঁ, ও লাঙ্গল ধর্‌বে না। লোকে বলে, ও লেখাপড়ায় চাকরী হবে না, তবু ওর বাবা এ-গাঁয় ও-গাঁয় বড় লোকের বাড়ী ঘুরে বেড়ায়।

—যখনই যাই, দেখি, চুপ ক'রে ব'সে আছে।

—কিচ্ছু করে না। উঠোনে ধান শুকাচ্ছে, গরু এসে খাচ্ছে, ও দেখেও নেমে তাড়ায় না।

একটু থেমে মামী বল্‌লো,

—কেন, ওর কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছিস্‌ কেন ?

—আমি বিলের ধারে গেলেই ও গিয়ে কেবল গোলমাল করে।

—যাস্‌নে সেখানে, ভারি বদ্ ছেলে।

কালী আর গেল না। কাজের অবসরে বাড়ীতে চুপ করে বসে থাকে। বাড়ীতে পাড়ার কেউ বেড়াতে এলে সেও বেড়াবার ছল করে পাশের কলা বাগানে প্রবেশ করে। কোন্ কাঁদিটা কতখানি পুরে উঠেছে, কোন্ মোচাটা আর কতদিন পরে কাটা যাবে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আর হিসেব করে। মাখনের মত নরম সন্তজাত কলার পাতার খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে ছু'হাত দিয়ে মুখের কাছে ধরে ফুঁ দিয়ে ফাটায় আর বাড়ীর দিকে চেয়ে দেখে যারা এসেছিল তারা চলে গেছে কি না। এমনিভাবে মাস তিনেক কেটে গেলে একদিন মামী বল্‌লো, আজ আর রাঁধবার কিছু নেই কালি, যা ছুটো শাক তুলে আন্‌গে।

কালী তৎক্ষণাৎ চলে গেল।

সবে মাত্র গিয়ে দাঁড়িয়েছে ছেলেটা নিঃশব্দে পিছন দিক দিয়ে এসে তার কাপড় টেনে ধরে আস্তে আস্তে বল্‌লো,—এই, শোন্ শোন্।

—কি বলো না।

—বল্‌ছি, এই দিকে আয়, বলে তার কাপড় ধরে টান দিল।

—কোন্ দিকে ?

—ঐ যে চারা বাবলাগাছগুলো, ওখানে।

কালী এক টানে কাপড়ের খুঁটটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বল্‌লো,—আমাকে তুমি জান না, তোমার মত বেটা ছেলেকে আমি এক হাটে বেচে আর এক হাটে কিন্‌তে পারি।

"তাই নাকি", বলে' ছোক্‌রা একটু হাস্‌বার চেষ্টা কর্‌তেই কালী সজোরে তার কপালে এক ঘুসি বসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ছোক্‌রা কপাল ধরে বসে পড়লো। ওদিকে কালী বাড়ী গিয়ে মামীকে সব কথা বল্‌লো।

মামী তখন ঘর নিকাচ্ছিল, শুনেই আর কোন

কথা না বলে সোজা চলে গেল তাদের বাড়ী। ছোক্‌রা সেই মাত্র এসে দাওয়ায় বসেছে। মামী চীৎকার করে বল্‌লো,

—তোর মুখে মার্‌বো লাথি, পোড়ারমুখো ছোঁড়া, লাথিয়ে তোর মুখ ছিঁড়ে দেব। কেন, ওর কাপড় ধরে টেনেছিস্‌ কেন? ছোক্‌রার মা ঘটনাটার কিছু না জান্‌লেও কথা শুনে বুঝে নিল ব্যাপারটা কি ঘটেছে। অমনি এসে ছেলের সুমুখে দাঁড়ালো। তারপরেই কে ভাল, ছোঁড়াটা, না, ছুঁড়িটা তাই নিয়ে ক্ষিপ্ত কণ্ঠের তুমুল কলহে সমস্ত গ্রাম তোলপাড় হয়ে গেল। পাড়ার মেয়েরা সব এসে জান্‌লো। কেউ ছোঁড়াটার নিন্দা কর্‌লো কেউ আবার তারই হয়ে কথা বল্‌লো। আর কেউ কেউ উভয়ের গলার তেজ ও বিচিত্র হস্তপদ সঞ্চালনের সহিত মধুর রচনাবলীর রস উপভোগ কর্‌লো। যখন সকলে বাড়ী ফির্‌লো তখন আর না ফির্‌লে নয়। ভাত হবে না। মাঠ থেকে বাড়ী আস্‌বার সময় হয়েছে।

কিন্তু এখানেই শেষ হ'ল না। ঘণ্টা দুই পরে দুপুরের নীরব পল্লী আবার সরগরম হ'য়ে উঠ্‌লো। কালীর মামা মাঠ থেকে এসে সব শুনে জ্বলে উঠ্‌লো। 'হতভাগা ছোঁড়া রমানাথের এঁড়ে, তার এই কাজ! পা ধরে দিচ্ছি আছাড়।' বলেই গিয়ে ছোক্‌রার হাত ধরে টেনে নামিয়ে ঘা কয়েক দিয়ে দিল। সে চীৎকার করে উঠ্‌লো। পাড়ার মেয়েরা ছুটে এসে গলি ঘুঁজি আড়াল থেকে উঁকি দিল। ছেলেটার মা রান্নাঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে যা মুখে এলো তাই বলে গালি দিয়ে বল্‌লো, আসুক্ বাড়ী, শোধ নিতে পারি কি না দেখ্‌ব। এখানেও ব্যাপারটা শেষ হ'ল না। ছেলেটার বাপ বাড়ী এলে আর এক দফা হবে। সে কথা পাড়ার লোকেও জান্‌লো, কালীর মামাও জান্‌লো। অনেকে মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে দেখে গেল লোকটা এলো কি না। তাদের ঔৎসুক্যের অন্ত নেই। বাড়ী গিয়ে নেয়ে খেয়ে কালীর মামাও উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায়

সময় কাটাতে লাগ্‌লো। দুপুরের পর অপরাহ্ন, অপরাহ্নের পর সন্ধ্যা এসে পড়লো, কিন্তু প্রতি আক্রমণ এলো না। ছেলেটির বাবা ধীরমস্তিষ্ক প্রৌঢ় ব্যক্তি। বাড়ী এসে সব শুন্‌লো, বুঝলো অন্যায় তার ছেলেরই। তাই চুপ করে গেল। কালীর মামা প্রথমটা বিস্মিত, পরে নিশ্চিন্ত হ'ল। কালীকে বল্‌লো—

—আর দিন কতক পরে তোকে রেখে আস্‌বো।

কালী তৎক্ষণাৎ মুখের ওপর জবাব দিল, যাই না যাই আমার ইচ্ছে।

তাকে নিয়ে এত কাণ্ড ঘট্‌লেও কালীর কিছুমাত্র সঙ্কোচ বা লজ্জা হয় নি। বরং এক ঘুসিতে সে যে ছোঁড়াটাকে বসিয়ে দিয়েছিল তাতেই সে খুসী হয়েছিল বেশী। কিসের লজ্জা! অন্যায় কর্‌লেও ছেলেদের লজ্জা হয় না, আর কোন কিছু না কর্‌লেও তাদের লোকলজ্জায় জড়সড় হতে হবে! কেন?

* * *

১২

গভীর রাত্রে প্রবল জ্বরের মধ্যে নবীনের ঘুম ভেঙে গেল, সে চোখ মেলে চাইবার চেষ্টা কর্‌লো। মাথায় প্রচণ্ড বেদনা। সমস্ত শরীর সর্দ্দিতে ভর্ত্তি। নিশ্বাস ফেল্‌তে কষ্ট হয়। গাড়ীর তলা থেকে বার হতে যত আকু-পাকু করেছে, মাথায় তত চোট লেগেছে। কিছু বুঝ্‌তে পারে নি। এখন ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছিল, দম বন্ধ হয়ে মহাপ্রাণটা বার হয়ে যাচ্ছিল। ভাল করে তাকাতে পার্‌লো না। চোখের পাতা ভারী, জলভারাক্রান্ত। অনেক কষ্টে পাশ ফিরে শুয়ে সে চোখ বুজ্‌লো।

পরদিন নবীন যখন চোখ মেলে চাইলো তখন অপরাহ্ণ তিনটে বেজে গেছে। চেয়েই দেখ্‌লো বিছানার ওপর বসে আছে শ্বাশুড়ী।

শ্বাশুড়ী জিজ্ঞাসা কর্‌লো—কেমন আছ বাবা?

—ভাল আছি, আমি সেরে গেছি।

বাইরে দাওয়ায় বসে বসে পাঁচকড়ি ভাবছিল। পনর ষোল ঘণ্টা নবীনকে অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় থাক্‌তে দেখে সে খুব শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। একটা পয়সা তার হাতে নেই, সমস্ত গ্রাম ঘুরে কারও কাছে কিছু পেলও না যে একটা ডাক্তার নিয়ে এসে দেখায়। নবীনের কথা শুনেই সে উঠে কাছে গেল। বল্‌লো,—কেমন আছ?

—সেরে গেছি।

পাঁচকড়ি তার কপালের ওপর একটা হাত রেখে বল্‌লো,—রাজেন ডাক্তারকে ডাক্‌লে আস্‌বে না? টাকা দু'দিন পরে দেব। আর না পারি বক্‌না বাছুরটা দিয়ে দেব।

—কোন দরকার নেই, আমি সেরে গেছি। ঠাণ্ডাটা খুব বেশী লেগেছিল কিনা, তাই জ্বর বেশী হয়েছিল। আর হবে না।

পাঁচকড়ি খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আবার বাইরে দাওয়ায় গিয়ে বস্‌লো।

নবীন ঠিকই বুঝেছিল। জ্বর আর হ'ল না।

তবে মাথার ব্যথা যন্ত্রণা দিতে লাগ্‌ল খুব। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলো অনেক বেলায়। চোখ মেলে চাইতেই দেখ্‌লো পাশে বিছানার ওপর বসে আছে কালী। দেখেই তার মনটা কেমন করে উঠ্‌লো, বল্‌লো,—আমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয়েছে, কালি?

কালী চুপ করে বসে রইলো।

—কি গো, বল্‌ছ না যে, হয়েছে আমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ?

কালী মাথা হেঁট কর্‌লো, কোন জবার দিল না।

—তা' হলে এখনও শেষ হয় নি, বুঝ্‌তে পেরেছি।

কালী ঝুঁকে পড়ে মাথা একেবারে বিছানার সঙ্গে এক করে দিল।

অসুখ থেকে উঠেই নবীন কাজে গেল। সে দিন মনটা তার বড্ড খুসী হ'ল। আনন্দ যেন আর চেপে রাখ্‌তে পার্‌ছিল না। আজ রান্না ভাত খেয়ে এসেছে। বাপ-মার ভিটেয় 'বউ' নিজের হাতে রান্না করে দিয়েছে। বাপ মা এতে খুসী

হবে না? তাঁদের উদ্দেশে অসংখ্য প্রণাম করে' আজ সে কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইলো। সেদিন গেটের সাম্‌নে মাগীটার সেই কদর্য্য অভিনয়ের পর থেকে তার সহকর্ম্মীরা যখন তখন তাকে ক্ষেপায়, বিদ্রূপ করে, সে আরও মরিয়া হয়ে ওঠে তার সঙ্কল্প রক্ষার জন্যে। কি কাজটাই সে করেছে! মাসে মাসে টাকাগুলো তার হাতে নিয়ে গিয়ে তুলে দিয়েছে।

সন্ধ্যেবেলা বাড়ী এসে দেখ্‌লো কালী ঘরের মধ্যে কুপি জ্বেলে কুলোয় করে ডাল ঝাড়ছে। পকেট থেকে নোটগুলো বার করে বল্‌লো,

—নোটগুলো তুই রেখে দে, আমার কাছে থাক্‌লে খরচ হ'য়ে যাবে।

কালী নোটগুলো নিয়ে তার বিয়ের-সময়-পাওয়া ছোট্ট ট্রাঙ্কটার মধ্যে রেখে দিয়ে আবার কাজে মন দিল।

—সব রেখে দিলি?

—তবে কি দুখানা আঁচলে বেঁধে রাখ্‌বো?

—আমাকে ছুটো টাকা দে

—তোমার দরকার ত আমাকে দিলে কেন ?

—সব ত নয়, ছুটো টাকা।

—কি হবে ?

—পকেট খরচার জন্যে। তোর ভয় নেই, মদ খাবো না, আর খেলেও মাতাল হব না। সারা মাসের জন্যে ঐ ছুটো টাকা ত, ওতে আর—আচ্ছা থাক্, অন্য সময় নেব।

কালী তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে বাক্স খুল্‌তে খুল্‌তে বল্‌লো,

—না না নাও, তোমার টাকা নিয়ে যাও।

—না না থাক্, দরকার নেই, তুই রাগ করিস্‌নে, তোর পায় পড়ি।

—আহা হা, কি কথার ছিরি !

নবীন আর কোন কথা বল্‌লো না, হাস্‌তে হাস্‌তে পাড়ার দিকে চলে গেল।

১৩

পাড়ার লোক তখনও খুব ব্যস্ত। ধানের পর্ব্ব শেষ করে তারা পাট নিয়ে পড়েছে। কেটে কেচে ঘরে তুল্‌তে পার্‌লে বাঁচে। মাসখানেকের জন্যে অনেকে মিলে একটা নৌকা ভাড়া করেছে। সকালে নৌকায় চড়ে যায়। সমস্ত দিন ধরে পাট কাচে। সন্ধ্যেবেলা কাচা পাট নৌকায় তুলে নিয়ে বাড়ী আসে। এক একদিন এক এক জনের কাজে যায়। যারা যায় না, একা একা কাজ করে, তারা সন্ধ্যের পর নৌকা নিয়ে যায় দু'আনা ভাড়ায়।

সেদিন ক্ষুদিরাম নৌকা নিল। নবীনকে বল্‌লো, দাদা, যাবে একটু সঙ্গে হালটা ধরে? বাবার শরীর তেমন ভাল নয়। নবীন বল্‌লো, চলো।

ধবধবে-জ্যোৎস্না-রাত। এখান থেকে ওই গ্রামের কোল পর্য্যন্ত একটানা ঘোলা জলরাশি

পরিষ্কার দেখা যায়। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। নবীন ক্ষুদিরামের সঙ্গে চাঁদের আলোয় নৌকা ভাসালো। মাঠের মাঝামাঝি এলে জিজ্ঞাসা কর্‌লো, ক্ষুদিরাম, সমুদ্দুর দেখেছিস্‌?

—না।

—আমিও দেখিনি। জনমই বৃথা, জগতের কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না। তবে শুনেছি যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল জল আর জল। কুল কিনারা নেই। এর কিনারা আছে, তবে অনেক দূর। তা' হ'লে এই রকমই অনেকটা।

ক্ষুদিরাম দাঁড় বন্ধ করে' একবার চারিদিক তাকিয়ে আবার টান্‌তে আরম্ভ কর্‌লো।

কখনও গভীর বিল কখনও উঁচু ধানের জমির ওপর দিয়ে নৌকা চল্‌তে লাগ্‌লো। অল্প জলে চল্‌বার সময় তলায় কেশে ঘাস লেগে সড় সড় শব্দ হতে লাগ্‌লো। ক্রমে নৌকা আরও দূরে চলে গেল। মাঠের নিস্তব্ধতা হ'য়ে উঠ্‌লো গাঢ়তর।

আজ নৌকাওয়ালারা যেখানে দলবলে পাট

কেচেছিল সেই স্থানটি বাঁয় রেখে নৌকা বাঁশগাড়ীর মাঝ দিয়ে চল্‌তে লাগ্‌লো। আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ক্ষুদিরামদের জায়গায় পৌঁছে যাবে।

'বাঃ কি সুন্দর! কি মধুর!' নবীন বলে' উঠ্‌লো।

ক্ষুদিরাম পিছন দিকে তাকিয়ে বল্‌লো, কারা জলে বেড়াতে এসেছে।

ছোট্ট একটি নৌকা পাশ দিয়ে চলে গেল। যেন পূর্ণপাত্রের মুখাবরণ উন্মোচন করে' সঙ্গীত-সুধা ছড়াতে ছড়াতে গেল। মুহূর্ত্তে নবীনের মনটাকে করে দিল আচ্ছন্ন। এত মিষ্টি সুর।

—চল না ক্ষুদিরাম, ওদের পিছনে পিছনে খানিক দূর যাই।

—না, দাদা, না, রাত হয়ে' যাবে।

—মিনিট পাঁচেকের জন্যে।

—না, দাদা, তোমার পায় পড়ি।

সমস্ত দিন ধরে' পাট কেচে তার শরীর অবসন্ন। বাড়ী গিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়্‌তে পার্‌লে বাঁচে। গান

শুন্‌বার মত মন ও শরীরের অবস্থা তার নয়। নবীনকে নিবৃত্ত হ'তে হ'ল।

নৌকা যখন পাটের বস্তার কাছে এসে ভিড়্‌লো তখনও সেই মিষ্টি সুর মাঠের আর এক প্রান্ত থেকে চাঁদের আলোয় জলের হাওয়ায় ভেসে তার কাণে আস্‌তে লাগ্‌লো। দু'জনে ধরাধরি করে বস্তা ক'খানা নৌকায় তুলে যখন তারা আবার চড়ে বস্‌লো তখন হারমোনিয়মের সুর আর কাণে আস্‌ছিল না। ভ্রমণকারীরা দূরে চলে গেছে।

ক্ষুদিরাম বল্‌লো, সোজা বোধ হয় যাওয়া যাবে না, শিমূল তলায় নৌকা বোধ হয় বেধে যাবে। চল বড় খালের মুখ দিয়ে ঘুরে যাই।

একটু একটু হাওয়া দিচ্ছিল। ক্ষুদ্র তরঙ্গে নির্ম্মল জ্যোৎস্না চিক্ চিক্ কর্‌ছিল। তার ওপর দিয়ে ক্ষুদ্র তরণী পূর্ব্ব মুখে ভেসে চল্‌লো। ডাইনে একটু দূরে পাটকপাটির গাদা। যেন কতকগুলি বিরাট অতিকায় জীব সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে সারি বেঁধে বসে আছে। সেই দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে

থেকে নবীন বল্‌লো,—তোর প্রাণে একটু রস-কস নেই ক্ষুদিরাম, ছেলেমানুষ, স্বাধীন কাজ করিস্, মনে আনন্দ নেই কেন?

—রস শুকিয়ে গেছে দাদা, সমস্ত দিন পাট কাচি রোদ মাথায় নিয়ে জলে দাঁড়িয়ে। পা দুটোর অবস্থা দেখেছো? হেজে এক আঙ্গুল করে মাংস ক্ষয়ে গেছে। বাড়ী গিয়ে একটু গরম তেল মালিস করে' শুয়ে পড়তে পার্‌লে বাঁচি।

নবীন আর কিছু বল্‌লো না। পাছে, কি কথায় কি কথা এসে পড়ে। রূপালি ঢেউয়ের উপর দিয়ে নৌকা নিঃশব্দে ভেসে চল্‌লো। বাঁকের মুখ পেরিয়ে যখন পশ্চিমমুখী হ'ল ক্ষুদিরাম বল্‌লো, স্বাধীন কাজ করি কথাটা শুন্‌তে বেশ ভাল যদি পেট ভরে খেতে পেতাম, আর যদি মহাজনের মন জুগিয়ে চল্‌তে না হ'ত। একটু ডাইনে চেপে নবীন দা, ওই যে কতকগুলো খুঁটি পোতা আছে দেখ্‌ছো, ওখানে মণ্ডলরা পাট পচাতে দিয়েছে। ওর ওপর দিয়ে যেয়ো না। নবীন দশ

হাত তফাৎ দিয়ে নৌকা চালালো। ক্ষুদিরাম বল্‌লো,

বন্যে এলে আশপাশের পাঁচখানা গাঁর ভদ্দর লোকদের খুব আনন্দ, দিনে রেতে যখন ইচ্ছে বেড়াতে বেরোয়, কিন্তু মাঠের ফসল ডুবে গেল যাদের তাদের কথা একবার জিজ্ঞাসাও করে না।

—দুটো কলমি শাক নেওয়া যাক্ ক্ষুদিরাম।

—নাও।

নবীন নৌকা লাগিয়ে দিল কলমির দামে। লতাগুলো শুক্‌নো মাটিতে লতিয়ে লতিয়ে বেড়াচ্ছিল, বন্যার জল আসায় ক'দিনের মধ্যে জলের ওপর ভেসে উঠেছে। লতা-পাতাও হ'য়ে উঠেছে অনেকখানি সতেজ।

—তুই দুটো নে।

—আমার দরকার নেই।

—দরকার নেই কিরে, পার্‌ছিস্‌নে বল্?

নবীন তাকেও এক তাড়া তুলে দিল।

বাড়ী গিয়ে ডাকামাত্র কালী ঘরের খিল খুলে একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হ'য়ে বার হ'ল।

—কোথায় থাকা হয়েছিল এত রাত পর্য্যন্ত ?

—একটু নৌকায় গিয়েছিলাম ক্ষুদিরামের সঙ্গে।

—নৌকায় গিয়েছিলাম।

—মাইরি বল্‌ছি।

—কেন, তাদের লোক নেই ?

—তার বাবার শরীর ভাল নয়।

—তোমার শরীর ভাল ত ? ঠাণ্ডা লেগে আবার জ্বর হ'লে পয়সা খরচ করে দেখাবে কে, ক্ষুদিরাম ?

—বল্‌লে কি করা যায় বল ?

—তুমি একবার বলে' দেখো দেখি তোমার কাজগুলো করে দিতে। রান্নাঘর ঢেঁকির ঘর তুল্‌তে হবে না, গোয়ালটা সারাতে হবে না, এম্‌নি পড়ো বাড়ী হয়ে থাক্‌বে'। কেন, কাজ করা যায় না জ্যোছ্‌না আলোয় রাত দুপুর পর্য্যন্ত ? নিজের কাজই যার পড়ে কাঁদে পরের কাজ কর্‌তে তার

লজ্জা করে না? যাও না, তাদের ডেকে এনে করিয়ে নাও না?

নবীন কলমি শাকগুলো দরজার কাছে রেখে বল্‌লো,—তুই রাগ কর্‌ছিস, ডাক্‌লে কি তারা আসে না?

—তাই আনো না ডেকে।

—কথায় বলে মরা হাতীর লাখ টাকা দাম, জানিস্?

—লজ্জা থাক্‌লে ও কথা আর মুখ দিয়ে বার কর্‌তে না।

—আচ্ছা আর কখনও কর্‌বো না, তবে তারা আসে কিনা দেখিস্, কাজ তাদের একটু কমুক্।

তারপর কাজ কমে গেলে নবীন সত্যিই তাদের ডেকে এনে ঘর-দুয়োর সারিয়ে নিল।

দুপুর বেলা। ভাদুরে রোদ চম্ চম্ কর্‌ছিল। রাজেন ডাক্তারের স্ত্রী ও কন্যারা খেয়ে-দেয়ে বারান্দায় বসে' গল্প কর্‌ছিল। কে একটি স্ত্রীলোক বাড়ীর ভিতর উঁকি দিয়েই মুখ সরিয়ে নিল। ডাক্তার-বাবুর স্ত্রীর চোখে পড়্‌লো। তিনি উন্মুখ হ'য়ে চেয়ে রইলেন। আর একবার উঁকি দিয়ে মুখ সরিয়ে নিতেই ডাক দিলেন,—কে গো, এস না এই দিকে।

কালী জড়সড় হয়ে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কর্‌লো।

ডাক্তার-পত্নী তার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন,

—কি হয়েছে ?

তিনি ভেবেছিলেন, ডাক্তার-বাবুকেই ডাক্‌তে এসেছে। কিন্তু কালী কাপড়ের মধ্যে থেকে একটি পকেট ঘড়ি বার করে বল্‌লো,

—তোমাদের ঘড়ির সঙ্গে এইটে মিলিয়ে দাও না, অনেক তফাৎ হয়ে গেছে।

—তুমি কোন্ গাঁ থেকে আস্‌ছ?

—ঐ যে ওই গাঁ। কেন, আমাকে চিন্‌তে *পার্‌ছ না? ছোট বেলায় এখানে কত খেলা কর্‌তে* এসেছি।

—এ ঘড়ি কার

—বেলা হ'য়ে গেছে, বেলা হ'য়ে গেছে, গাড়ী পাওয়া যাবে না—বলে' এক গ্রাস মুখে না দিতেই উঠে পড়লো, গাড়ী এল তার কত পরে।

এই সময় ডাক্তার-বাবু একবার ঘরের ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে দেখে, আবার গিয়ে শুয়ে পড়্‌লেন।

—তোমার স্বামী বুঝি কোথায় কাজ কর্‌তে যায়?

—হ্যাঁ, কলকাতায়, ভাব্‌লাম ষ্টিশানের দিকে যাই, কিন্তু সেখানে অনেক লোক, তাই তোমাদের বাড়ী এলাম।

—বেশ করেছ।

ডাক্তার-বাবুর একটি মেয়ে ঘড়িটি ঠিক করে মিলিয়ে দিল। কালী ঘড়িটা কাপড়ের মধ্যে নিয়ে উঠে পড়লো। দুপুর বেলা সকলেই যখন খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করছিল সেই ফাঁকে সে এই এক ক্রোশ রাস্তা হেঁটে এসেছিল ঘড়ি মিলিয়ে নিতে।

ডাক্তার-বাবু বললেন, ও মেয়েটা কেশবপুরের পাঁচকড়ির মেয়ে। হরিচরণের ছেলে নবে মাতালের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে। কিন্তু ও ত ঘর করতো না, ওদের অত মিল হ'ল কবে!

গ্রন্থকারের আর একখানি উপন্যাস

"দেবেশ"

সম্বন্ধে অভিমত—

প্রবাসী বলেন—

"দেবেশ একখানি উপন্যাস। বইটি লিখিতে লেখক শক্তি সাহস উভয়েরই পরিচয় দিয়াছেন। নীচ জাতির মধ্যে শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে গিয়া দেবেশ তাহাদেরই এক কন্যার সংস্পর্শে আসিল। জনসেবার আনন্দের মধ্যেই একদিন নিদারুণ দুঃখের আঘাত পাইয়া যখন বুঝিল তাহার পরিচয় প্রণয়ের অবান্তর কোঠায় উঠিয়া গিয়াছে, দেবেশ সে আসক্তিকে অস্বীকার করিল না। বিবাহের দ্বারা তাহাকে নিজের জীবনে বরণ করিয়া লইল। এই পরিণতিটুকু ঘটাইতে লেখক দুঃখ-নিরাশার যে আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে। বইয়ের ভাষা অনাড়ম্বর, অযথা বাগ্-বিস্তারের চাপে গল্পের গতি-বেগ কোথাও ব্যাহত হয় নাই।

যুগান্তর বলেন—

"পঁচিশ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বাংলা সাহিত্যে অনর্গল উপন্যাস বাহির হইতেছে। সুতরাং আগে যেমন একখানি যে কোন উপন্যাস বাহির হইবার সময় পাঠক

সাধারণ্যে হৈ চৈ পড়িয়া যাইত এখন আর তাহা হয় না। বাংলা দেশে উপন্যাস বাড়িল, কিন্তু তার সঙ্গে জীবনের ক্ষেত্র প্রশস্ত হইল না। সেই কারণে চিরাচরিত বিষয়বস্তু লইয়া একইভাবে নাড়াচাড়া করার জন্য উপন্যাস পড়িবার আগে আমাদের ঔৎসুক্য হয় না। কিন্তু এই বইখানি পড়িতে বসিয়া লেখকের গল্পকুশল লেখনীর সাবলীলতাকে স্বচ্ছন্দে স্বীকার করিতে হইল। উপন্যাসখানির ভিতরে বাস্তবের সহিত রস-কল্পনার এমন একটি সূক্ষ্ম স্বাভাবিক যোগ আছে এবং এই দুইয়ের সীমারেখা নির্ণয় ও বর্ণবিন্যাস এমন সুষ্ঠু হইয়াছে যে, পাঠকগণ তাহাতে প্রচুর আনন্দ পাইবেন। গল্পের যে উপাদান উপন্যাস-লেখকের প্রাথমিক পরীক্ষার উপকরণ লেখকের হাতে সেগুলি যথেষ্টই আছে বলিতে হইবে। চরিত্র-বিকাশ ও গল্পের সহিত তাহার অখণ্ড সঙ্গতি লেখক কোথাও ক্ষুণ্ণ করেন নাই। বর্ত্তমান উপন্যাস-গুলির মধ্যে এই বইটি আপনার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারিয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।"